পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত

প্রহেলিকা সিরিজের ৫১ নং গ্রন্থ

পাতালপুরীর যাত্রী

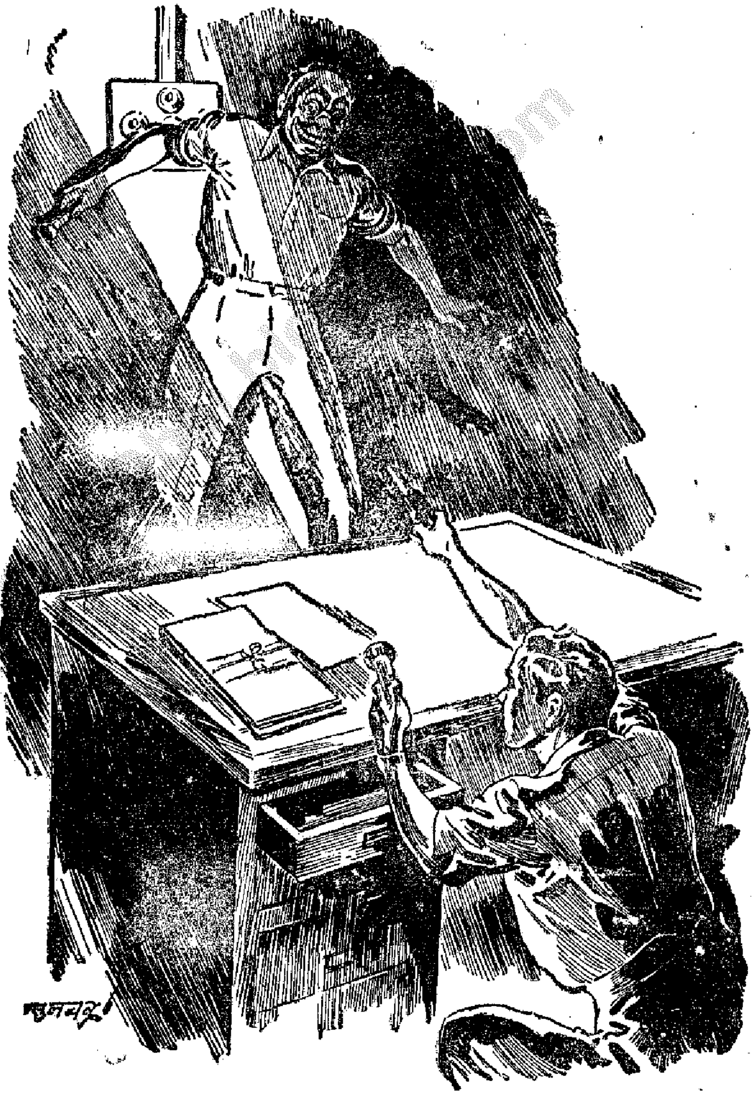

শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

PATALPURIR JATRI
CODE NO. 54 P 21

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

মে
১৯৮৫
৫

ছেপেছেন—
বি. সি. মজুমদার
দেব প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা-৯

দাম—
টা. ৬·০০

www.boiRboi.blogspot.com

SCANNED BY
SUDIP

পাতালপুরীর যাত্রী

এক

জানলার বাইরে আধো অন্ধকার প্রকৃতি কালো আকাশের ছায়ায় যেন চোখ বুঁজে পড়ে আছে।

নিঃশব্দ মহাকাশ—অস্পষ্ট পৃথিবী!

হাতের মণিবন্ধের দিকে তাকালেন অ্যাটর্নি সোমপ্রকাশ নাগ: সওয়া এগারোটা।

রাত অনেক হয়ে গেছে। আর বসে থাকা যায় না।

সোমপ্রকাশ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মণিবন্ধ থেকে হাত-ঘড়িটা খুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রাখলেন। তারপর হুকে টাঙ্গানো ঝাড় দেওয়াল-বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে খাটের উপরে এসে বসলেন।

কেমন যেন একটা অশরীরী ভয় থাবা পাতলো ওঁর মনের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে একটা মৌন বেদনা ওঁর পাঁজরগুলো ঠেলে উঠতে চাইলো।

এসময়ে দিলীপ যদি ওঁর পাশে থাকত।

তাহলে সোমপ্রকাশ বিন্দুমাত্র ভয় পেতেন না। ভয় পাওয়ার কোন কারণও থাকত না।

অবশ্যি কলকাতা থেকে এখানে আসবার আগে উনি দিলীপ

সান্যালের সহকারী ত্রিদিব চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে জানতে পেরেছিলেন যে, একটা বিশেষ কাজে দিলীপ কলকাতার বাইরে গেছে—দু'একদিনের মধ্যেই ফিরবে।

শুনে বেশ খানিকটা দমে গিয়েছিলেন উনি। তবে হতাশ হননি। একটা চিঠি লিখে ত্রিদিব চৌধুরীর হাতে দিয়ে বলেছিলেন, দিলীপ ফিরে এলে চিঠিটা যেন ওকে দেওয়া হয়।

চিঠিটা হাতে নিয়ে ত্রিদিব চৌধুরী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিল।

তারপর সেই রাত্রেই সোমপ্রকাশ কলকাতা ছেড়েছিলেন, এখানে আসবার জন্য।

www.boiRboi.blogspot.com

একটা চিন্তা চকমকি পাথরের ফুলকির মত ঝিলিক দিয়ে ওঠে সোমপ্রকাশের মনের ওপর : চাবিটা পকেটে আছে তো?

সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা পকেটে চালান করে দেন। হ্যাঁ, চাবির রিংটা পকেটেই আছে।

জাপানী ঘাসের চটি থেকে পা দুটো সরিয়ে এনে সোমপ্রকাশ খাটের ওপর তুলে দেন। তারপর আস্তে আস্তে শুয়ে পড়েন।

কিন্তু ঘুম আসে না। দৃষ্টিটা সামনের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে ছেড়ে দেন।

কবরখানার মত থমথম করছে নির্বাক রাত্রি। খোলা জানলা দিয়ে ক্ষীণ চাঁদের ফ্যাকাশে আলো ঘরের একটা দিক মৃদু আলোকিত করেছে।

হঠাৎ কেমন যেন একটা খসখস শব্দ শুনতে পেয়ে সোমপ্রকাশ উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন।

দরজার কবাট তুটো সরে যায় তু'দিকে। শোনা যায়, অন্ধকারে একটা সাবধানী চাপা পায়ের শব্দ! সোমপ্রকাশের দিকে এগিয়ে আসছে এক মনুষ্যমূর্তি।

—কে? গম্ভীরকণ্ঠে বলে ওঠেন সোমপ্রকাশ।

হঠাৎ মনুষ্যমূর্তি থমকে দাঁড়ায়। কোমর থেকে কি যেন বের করে।

চাঁদের বিশীর্ণ আলোয় মূর্তিটার হাতে একখানা তীক্ষ্ণ বাঁকানো ছোরা মৃত্যুক্ষুধায় লকলক করে ওঠে।

সেই মুহূর্তে মূর্তিটার মুখ থেকে পাথরের মত শক্ত অথচ চাপা গলা শোনা যায়—চিৎকার করে কারো ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করবেন না মিষ্টার নাগ। যেমন শুয়ে আছেন, তেমনি থাকুন।

ওর গলার স্বরটা চেনা চেনা মনে হয় সোমপ্রকাশের। একটা অশুভ আশঙ্কায় চকিত হয়ে ওঠেন তিনি।

জিজ্ঞাসা করেন—কে তুমি? কি চাও এখানে?

ওর কথাটা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে মূর্তিটি বলে—আমি কে সে খবরে আপনার দরকার নেই, তবে কি জন্য এসেছি তা অবশ্যই জানতে পারবেন। আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা নিতে।

লোহার সিন্দুকের চাবি! কতকটা স্বগতোক্তির মতই কথাটা বের হয়ে আসে সোমপ্রকাশের মুখ থেকে।

এগিয়ে আসে মূর্তিটা। অস্পষ্ট চাঁদের আলোর যেটুকু ঘরে এসে ঢুকেছিল সেই আবছা আলোয় সোমপ্রকাশ লক্ষ্য করেন যে মূর্তিটার

www.boiboi.blogspot.com

মুখে একখানা কাল কাপড়ের ঢাকনা, কেবল চোখ দুটোর কাছে দুটো বড় বড় ছিদ্র।

মূর্তিটার হাতের ছোরাখানা চকচক করে ওঠে।

ডান হাত দিয়ে ছোরাখানা সোমপ্রকাশের বুকের উপর উঠিয়ে ধরে মূর্তিটা বলে—কই? বের করুন চাবি। দেরি করে বিপদ বাড়াবেন না মিষ্টার নাগ।

এই দ্বিতীয়বার মূর্তিটা 'মিষ্টার নাগ' বলে সম্বোধন করলো সোমপ্রকাশকে।

তিনি বললেন—তুমি আমাকে চেনো দেখছি।

—তা চিনি বৈ কি! যাই হোক, চেনা পরিচয় করবার উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি আমি। যদি বাঁচতে চান তাহলে ভালয় ভালয় চাবিটা বের করে দিন।

—যদি না দিই?

তাহলে আপনার অদৃষ্টে জুটবে মৃত্যু। হিমশীতল মৃত্যু!

সোমপ্রকাশ কি যেন চিন্তা করে বলেন—বেশ তাই হোক; জীবিত অবস্থায় তোমাকে চাবি দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করতে আমি পারব না। আমাকে হত্যাই কর তুমি।

মূর্তিটা সোমপ্রকাশের কথা শুনে কি যেন ভাবল।

তারপর বলল—না। আপনাকে হত্যা না করেও কাজ উদ্ধার করতে পারব আমি। অকারণে নরহত্যা করবার ইচ্ছা আমার নেই।

এই বলেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে কি যেন বের করে মূর্তিটা। তার-পর সোমপ্রকাশের কাছে আরও এগিয়ে এসে ছোরাখানা তাঁর বুকের

www.boiRboi.blogspot.com

কাছাকাছি ধরে অন্য হাতে একখানা ভিজা রুমালের মত জিনিস চেপে ধরে তাঁর নাকের উপরে।

একটা মিষ্টি গন্ধ।

তারপরেই ঝিমিয়ে পড়েন সোমপ্রকাশ। যেন আচ্ছন্ন হয়ে যান তিনি।

মূর্তিটা তখন ওঁর পকেট থেকে লোহার সিন্দুকের চাবিটা বের করে নিয়ে সন্তর্পণে বের হয়ে যায় ঘর থেকে।

www.boiRboi.blogspot.com

দুই

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে এগোয় মুখোশপরা সেই লোকটা। নীচে নেমে যায় সিঁড়িপথ ধরে।

আকাশের ক্ষীণ চাঁদ তখন মেঘে ঢাকা পড়েছে। বাইরে জমাট ভয়াল আঁধার।

হঠাৎ সেই ভয়াল অন্ধকারকে আরও ভয়াবহ করে তোলে হরিয়ালের আওয়াজ। হরিয়ালের ডাক শুনে দূর অরণ্যে কতকগুলো শেয়াল ডেকে ওঠে বিশ্রীভাবে। নিঃশব্দে এগিয়ে যায় লোকটা। অতি সন্তর্পণে পা টিপে টিপে নীচের একখানা ঘরের ভিতর প্রবেশ করে সে। ঐ ঘরেই আছে সেই লোহার সিন্দুকটা।

লোকটা এগিয়ে যায় সিন্দুকটার দিকে।

কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে। তারপর পকেট থেকে চাবি বের করে সিন্দুকটা খুলতে চেষ্টা করে।

খুট করে একটা শব্দ হয়। খুলে যায় সিন্দুকটা।

সিন্দুক খুলে ওর ভিতরের প্রত্যেকটা টাকা পরীক্ষা করতে থাকে লোকটা টর্চ জ্বেলে। কিছুক্ষণ পরে একখানা ভাঁজকরা দলিলের মত জিনিস বের করে আনে সে। তারপর টর্চের আলোটা সেই দলিলের মত কাগজের উপর ফেলে তার অনুসন্ধানী চোখ দুটোকে ছেড়ে দেয় তার উপরে। গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তে থাকে সে।

পড়তে পড়তে তার চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। হয়তো পৈশাচিক হয়ে ওঠে মুখোশের নীচেকার মুখখানা।

সে যখন সেই দলিলখানা (এর পর দলিলই বলব) ভাঁজ করে পকেটে পুরতে যাবে ঠিক এই সময় 'ধুপ.' করে একটা শব্দ হয় তার পিছনে।

চমকে উঠে পিছন ফিরে তাকায় সে। কিন্তু তাকিয়েই ভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

আধো অন্ধকারে একটা ভয়াবহ কালো জীব এগিয়ে আসছে তার দিকে। জীবটাকে অনেকটা ত্রিভুজের মত দেখতে। হাত পা মাথা কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ সেই ত্রিভুজাকৃতি জীবটা দু'দিকে দু'খানা ডানা মেলে দেয়। পায়ে হেঁটে এগোয় না, যেন ডানায় ভর দিয়ে ভয়াবহভাবে এগিয়ে আসতে থাকে লোকটার দিকে।

আত্মরক্ষার জন্য লোকটা তখন কোমর থেকে ছোরাখানা তুলে নেয়। দলিলখানা তার হাত থেকে পড়ে যায় মেঝের 'পরে।

আচমকা একটা ডানার ঝাপটা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সে। পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে শক্ত মুঠোয় ধরা ছোরাখানা দিয়ে সেই ভয়ংকর আকৃতির জীবটার বুকে আঘাত করে।

আশ্চর্য! ছোরাটা বুকে লেগেও বিদ্ধ হয় না। ব্যাপার দেখে ভয়ে তার হাতের মুঠোটা শিথিল হয়ে আসে। ফলে ছোরাখানা মেঝেতে পড়ে যায় সশব্দে।

সেই ভয়াবহ জীবটা তখন ক্ষুধিত নেকড়ের মত বিকৃত গর্জন করে ওঠে। সেই গর্জনের শব্দ দেওয়ালে দেওয়ালে একটা ভৌতিক বিভীষিকায় প্রেতায়িত হয়ে ওঠে যেন।

ইস্পাতের মত কঠিন দুখানা ডানার মাঝে আটকা পড়ে গেছে

www.boiRboi.blogspot.com

ততক্ষণ লোকটা। অনুচ্চ একটা আর্তনাদ বেরিয়ে আসে ওর মুখ থেকে।

মুক্তির জন্যে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু পারে না। কপাল ফেটে রক্ত বেরোয় দরদর ধারায়। দুটি ডানার বজ্র চাপে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে ওর।

যন্ত্রণায় একটা চাপা আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ে লোকটা মেঝের উপর।

ওর কপালের রক্ত দেখে ত্রিভুজাকৃতির ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো জ্বলে ওঠে হিংস্র শ্বাপদের মত।

কয়েক মুহূর্ত অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে অচেনা লোকটার দিকে। তারপর হঠাৎ বসে পড়ে তার গলার সামনে মুখখানা এগিয়ে নিয়ে আসে।

পাঁচ আঙুলের শক্ত নখের চাপে ছিঁড়ে যায় লোকটার গলার নলী। ফিনিক দিয়ে রক্ত বেরোয়।

সেখানে মুখখানা চেপে ধরে সেই ভয়ংকর জীবটা। জীবন্ত মানুষের রক্তপান করতে থাকে আকণ্ঠ।

তিন

কলকাতায় দিলীপ ফিরে এলে ত্রিদিব ওকে সোমপ্রকাশের চিঠিটা দিলো।

চিঠিটা পড়ল দিলীপ।

সোমপ্রকাশ লিখেছেন: কল্যাণীয় দিলীপ, সম্প্রতি আমার এক মক্কেল জমিদার ভুজঙ্গনারায়ণ রায়ের উইল-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে বিশেষ ভীত হয়ে পড়েছি। ভুজঙ্গনারায়ণ নিজের বাসস্থান মায়া-মঞ্জিলে দীর্ঘদিন ক্যানসারে ভুগে গতমাসে মারা গেছেন। ওঁর ছেলেদের মায়া-মঞ্জিলে একত্র করে এখন সেখানে চললাম। এ-সময়ে তুমি আমার সঙ্গে থাকলে বুকে বল পেতাম। কারণ না থাকলে তোমার সঙ্গ চাইতাম না। যাহোক, কলকাতায় ফিরে আসামাত্র স্বপনপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে অন্যথা করবে না। আশা করি, বৃদ্ধের এ অনুরোধটা রাখবে। সাক্ষাতে সমস্ত কথা হবে। কলকাতা থেকে যাওয়ার আগে আমাকে টেলিগ্রাম কোরো। কেন না, তোমার জন্যে পালকির বন্দোবস্ত করব। ইতি—

চিঠিটা দিলীপ বারকয়েক পড়ল। কিন্তু সোমপ্রকাশ কেন তাকে মায়া-মঞ্জিলে যেতে অনুরোধ করলেন তাঁর চিঠির ভেতর থেকে তা সে আবিষ্কার করতে পারল না।

সোমপ্রকাশ ওর বন্ধুর পিতা। তবে সোমপ্রকাশকে ও কোনদিন না দেখাতে তাঁর অনুরোধটা এড়িয়ে যেতে সে পারল না।

সেই বিকেলেই দিলীপ সোমপ্রকাশকে টেলিগ্রাম করে দিলো। তারপর সন্ধ্যার ট্রেনে স্বপনপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

রাত্রের বিলীয়মান অন্ধকারের অস্বচ্ছ যবনিকা একটু একটু করে নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছিল। ভোরের আলো সবে ফুটে উঠছিল।

সোমপ্রকাশের ঘুম ভেঙে গেল। চোখ খুললেন তিনি।

রাত্রের সেই ব্যাপারটা মনে পড়ে যেতেই পকেটে আচমকা হাত চলে গেল, চাবির রিংয়ের অস্তিত্বটা অনুভব করলেন।

তাহলে কি স্বপ্ন দেখছিলাম—ভাবলেন সোমপ্রকাশ।

ভাবনার তাড়নায় সোমপ্রকাশ চটিতে পা গলিয়ে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

তখনো বাড়িটা নিঃশব্দতার অতল সমুদ্রে তলিয়ে ছিল। কারো ঘুম ভাঙেনি।

দ্রুতপায়ে ভুজঙ্গনারায়ণের শয়নকক্ষে সোমপ্রকাশ প্রবেশ করলেন। ঘরে ঢুকেই বিস্ময় ও ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি।

একটা মানুষের মৃতদেহ। ব্যাপার দেখে তিনি তাই চিৎকার করে ডাকলেন—মুরারীমোহন—।

সাড়া এলো : যাই বাবু।

—শিগ্‌গিরি এসো। সোমপ্রকাশের গলার স্বরটা যেন দুর্বল শোনালো।

হন্তদন্ত হয়ে মুরারীমোহন ছুটে এল। সোমপ্রকাশের সামনে এসে থেমে গিয়ে বলল—আমকে কেন ডাকছিলেন অ্যাটর্নিবাবু ?

—ওই দেখো। সোমপ্রকাশ হাত বাড়িয়ে দরজার কবাটের পাশটা মুরারীমোহনকে দেখিয়ে দিলেন।

মুরারীমোহনের চোখ গেল সেদিকে। একটা উন্মাদনায় বিভ্রান্ত হয়ে ভয়ার্ত স্বরে বলল—এ যে দেখছি বড়দাদাবাবুর মৃতদেহ !

www.boiRboi.blogspot.com

চার

মহীতোষ, সন্তোষ ও অনুতোষ তিন ভাইকেই ডেকে তুললো মুরারীমোহন।

মুরারীমোহনের মুখ থেকে পরিতোষের নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে মহীতোষ, সন্তোষ ও অনুতোষ রায় নীচে নেমে এসে ভুজঙ্গনারায়ণের শয়নকক্ষে ঢুকল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল তিনজনে। তারপর বিস্বাদ গলায় মহীতোষ রায় বলল—বড়দা মরেছে, ভালোই হয়েছে—একটা বোঝা ছাড়া তো আর কিছু ছিল না!

সোমপ্রকাশ বললেন—ওরকম বলতে নেই মহীতোষ।

কেন বলব না মিষ্টার নাগ। আমি তো আর মিথ্যা কথা বলছি না। মহীতোষ রায়ের ঠোঁটদুটো ঘৃণায় ভারী হয়ে উঠলো!

হঠাৎ কাছারিঘরের বাইরের বারান্দায় কার যেন কণ্ঠস্বর শোনা গেল : সোমপ্রকাশবাবু আছেন?

সোমপ্রকাশ চোখ তুলে মুরারীমোহনকে ইশারা করলেন। ইশারাটা বুঝতে পেরে মুরারীমোহন প্রস্থান করল ঘর থেকে।

কয়েক মুহূর্ত কাটল নীরবতার ভেতর দিয়ে। একসময়ে সন্তোষ নীরবতা ভঙ্গ করে বলল—বাবার উইলটা আজ সকালে পড়া হবে তো, মিষ্টার নাগ?

—দেখা যাক! সোমপ্রকাশ জানালেন বিরসমুখে।

অনুতোষ রায় বলল—বড়দার ব্যাপারটা কি থানায় জানানো দরকার ?

সোমপ্রকাশ বললেন—নিশ্চয়ই !

—কিন্তু !—সন্তোষ বলল।

—না, এর ভেতর কোন কিন্তু-টিন্তু চলতে পারে না।

একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে সন্তোষ রায় বলল—বেশ, যা ভালো বোঝেন তাই করবেন।

মুরারীমোহন ঘরে প্রবেশ করে সোমপ্রকাশকে বলল—আপনার একখানা তার এসেছে অ্যাটর্নিবাবু।

—আমার তার ? সোমপ্রকাশ বেশ খানিকটা বিস্মিতই হন। পরক্ষণে একটা কথা মনে পড়ে যেতে ওঁর ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দেয়। লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি।

কাছারিঘরে এসে পিওনের কাছ থেকে টেলিগ্রামটা নিয়ে খুললেন।

দিলীপ টেলিগ্রাম করেছে। লিখেছে : আজ সন্ধ্যার ট্রেনে স্বপনপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি।

সমস্ত মুখে-চোখে খুশীর ফুলঝুরি জ্বলে উঠল সোমপ্রকাশের। গলা ছেড়ে ডাকলেন—মুরারীমোহন !

—আজ্ঞে যাই !

একটু পরে মুরারীমোহন কাছারিঘরে এলে, সোমপ্রকাশ ওকে বললেন—কয়েকজন বেহারা যোগাড় করে এক্ষুনি পালকিটাকে স্টেশনে পাঠিয়ে দাও। সাড়ে এগারোটার ট্রেনে দিলীপ সান্যাল বলে আমার একজন লোক আসবে। তুমিও বেহারাদের সঙ্গে স্টেশনে যাবে বুঝেছ !

—যে আজ্ঞে।

সোমপ্রকাশ বিজ্ঞের মত সূক্ষ্মরেখায় একটু হাসলেন।

ট্রেনটা এলো আধঘন্টা দেরি করে।

সেকেণ্ড ক্লাস 'কুপ' থেকে দিলীপ নামলো হোল্ড-অল আর সুটকেসটা নিয়ে।

সোমপ্রকাশ দিলীপের চেহারার যে বিবরণটা মুরারীমোহনকে দিয়েছিলেন, সেই বিবরণের ওপর নির্ভর করে মুরারীমোহন দিলীপের সম্মুখীন হয়ে সবিনয়ে বলল—আপনার নামই কী দিলীপ সান্যাল?

ওর মুখের পানে দিলীপ তাকালো। বলল—হ্যাঁ। তুমি কে?

কায়িক পরিশ্রমের সাক্ষ্য সবল পেশীপুষ্ট মুরারীমোহনের দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। উন্নত বিস্তৃত বক্ষ।

বয়স হয়েছে ওর। মুখে গোঁফ ও অযত্নবর্ধিত খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি। পরনে হাঁটু অবধি তোলা ধুতি—মালকোঁচা দিয়ে পরা। গায়ে বুক খোলা ফতুয়া।

দিলীপের প্রশ্নে ও বলল—আজ্ঞে। আমি মায়া-মঞ্জিলের চাকর। আমার নাম মুরারীমোহন। অ্যাটর্নিবাবু আমাকে পাঠিয়েছেন আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। চলুন, প্ল্যাটফর্মের বাইরে আপনার জন্যে পালকি অপেক্ষা করছে।

মুরারীমোহন দিলীপের হোল্ড-অল আর সুটকেসটা তুলে নিলো দু'হাতে।

দিগন্তব্যাপী সবুজ মাঠ এবং শ্বাপদসংকুল জঙ্গলাকীর্ণ ভয়াবহ নিরিবিলি পথ পেরিয়ে বিরাটকায় সুদৃশ্য পালকিটা মায়া-মঞ্জিলের ফটক দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল।

পালকির এক পাশের পাল্লা ঠেলে সরিয়ে দিলো দিলীপ। দৃষ্টিটা সামনের দিকে প্রসারিত করল।

প্রকাণ্ড দ্বিতল অট্টালিকা। সাবেক কালের তৈরী। নীচে থেকে আইভিলতার মোটা মোটা ডাল লতিয়ে লতিয়ে তেতলায় উঠে গেছে।

ফাটল ধরেছে ইমারতের জায়গায় জায়গায়। ছাদের কার্নিশ বেয়ে একটা নিমগাছ নির্লজ্জভাবে উদ্ধত আত্মপ্রকাশ করেছে।

বেহারাদের গুঞ্জন-ধ্বনি শুনে সোমপ্রকাশ বৈঠকখানার বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

বেহারার দল যথাস্থানে পৌঁছে বৈঠকখানার সিঁড়িপ্রান্তে ধীরে ধীরে নামিয়ে দিলো পালকিখানা। পরিশ্রমে ওরা হাঁফাতে লাগল।

উজ্জ্বলমুখে সোমপ্রকাশ নেমে এলেন সিঁড়িপ্রান্তে। দিলীপ পালকি থেকে নামলে ওকে অভ্যর্থনা করলেন।

দুজন বেহারা পালকি থেকে দিলীপের সুটকেস ও হোল্ড-অল তুলে নিলো।

দিলীপকে নিয়ে সিঁড়িপথ দিয়ে উঠতে হঠাৎ বারান্দায় নজর পড়ে সোমপ্রকাশের। বারান্দায় অনুতোষ দাঁড়িয়ে রয়েছে অনড় হয়ে। ভাবের চিহ্নহীন মুখ।

দিলীপ বলে—ও ভদ্রলোক কে ?

সোমপ্রকাশ জানান—ভুজঙ্গনারায়ণের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর ছোট ছেলে অনুতোষ রায়।

—আশ্চর্য ! আচমকা কথাটা বেরিয়ে যায় দিলীপের মুখ থেকে।

সোমপ্রকাশ বললেন—কিছু বললে দিলীপ ?

—হ্যাঁ। ভদ্রলোকের নাম যে অনুতোষ রায়, আপনার মুখে আজ

এই প্রথম শুনলাম। ওঁকে বিশ্বম্ভর হাজরা বলেই তো জানি। দু'বার ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে বেশ কয়েক বছর জেল খেটেছেন।

—তাই নাকি?

আর কোন কথা হয় না ওদের মধ্যে। সিঁড়িপথ ধরে উঠতে থাকে। দিলীপ তেরছা চোখে অম্বুতোষ রায়ের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে নেয় একবার।

রোগা লম্বাটে গড়ন অম্বুতোষ রায়ের। গালদুটো ভাঙা ভাঙা, চোয়াল জেগে উঠেছে। কপালে গভীর রেখা। কালো লম্বাটে মুখখানায় কেমন এক করুণ শীর্ণতা।

দু'জন বেহারা হোল্ড-অল আর স্যুটকেসটা বারান্দায় নামিয়ে রাখতে সোমপ্রকাশ পকেট থেকে পার্স বের করে ওদের একজনের হাতে একখানা দশটাকার নোট তুলে দিয়ে বলেন—এই নাও, তোমাদের বকশিশ।

বেহারা দু'জনে ভক্তিভরে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিল।

দিলীপ সোমপ্রকাশকে বলল—এ বাড়ির চাকর মুরারীমোহনকে তো দেখছি না। ও তো পালকির পেছন পেছনই আসছিল।

—ওকে থানায় পাঠিয়েছি। বললেন সোমপ্রকাশ।

—থানায়? কি ব্যাপার বলুন তো!

—কাল রাত্রে এ বাড়িতে একটা নরহত্যা হয়ে গেছে। ভুজঙ্গনারায়ণের বড় ছেলে নিহত হয়েছে গত রাত্রে।

—বলেন কি? মৃতদেহটা কোথায়?

—এখানেই আছে। দেখতে চাও?

—হ্যাঁ।

দীর্ঘ টানা বারান্দার একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরখানা ভুজঙ্গনারায়ণের শয়নকক্ষ।

সেই শয়নকক্ষে প্রবেশ করল তু'জনে।

প্রাণীহীন নিস্পন্দ ঘর। আসবাবপত্রের বিশেষ তেমন বালাই নেই।

একদিকে মেহগনি কাঠের পালঙ্ক। পালঙ্কের 'পরে শয্যা বিছানো। অন্যদিকে একটা আয়রণ-সেফ।

দেয়ালে সুন্দর সব অয়েলপেন্টিং।

ঘুরে দাঁড়ালেন সোমপ্রকাশ। ডান হাতখানা প্রসারিত করে মৃত-দেহটা দেখিয়ে দিলেন।

ঘরের মেঝেয় চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েছে এক হতভাগ্য মানুষ। গলার নলীটা ছেঁড়া বীভৎসভাবে।

মৃতব্যক্তি ছ'ফুটের মত লম্বা ছিল। সৌম্য প্রশান্ত চেহারা।

দিলীপ অদম্য কৌতূহলে হাঁটু গেড়ে বসল। ডান হাতের সমস্ত শক্তি একত্র করে মৃতদেহটা তুলতে চেষ্টা করল। সেই মুহূর্তে মৃত ব্যক্তির ভেঙে যাওয়া মেরুদণ্ডের অন্যতম ক্ষুদ্রাস্থিগুলো থেকে কড়মড় করে একটা বিশ্রী আওয়াজ বেরিয়ে এলো। দিলীপ বলল—লোকটার পিঠের শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে দেখছি। যে লোক একে নিহত করেছে, সে অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মানুষ।

সোমপ্রকাশ নিরুত্তর রইলেন। ওঁর দাঁতের ওপরের পাটিটা নীচের ঠোঁটটা স্পর্শ করল।

উঠে দাঁড়ালো দিলীপ। বলল—কে খুন করেছে, জানতে পেরেছেন?

—না।

দিলীপ বলল—থানায় খবর দিয়ে ভালোই করেছেন। যাদের কাজ, এখন তারাই করুক।

—কিন্তু একটা বিষয় কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না, দিলীপ—

—কী ?

দিলীপের প্রশ্নের উত্তরে সোমপ্রকাশ বললেন—সারারাত ট্রেন-জার্নি করে এসেছো, আগে তোমার চায়ের ব্যবস্থা করি। চা খেতে খেতেই সব কথা বলবো তোমাকে।

এর প্রায় আধঘন্টা পরে সোমপ্রকাশবাবুর ঘরে বসে চা খেতে খেতে কথা হচ্ছিল তাঁর আর দিলীপের মধ্যে। সোমপ্রকাশবাবু গত রাত্রের ঘটনার কথা সব কিছু দিলীপকে খুলে বলবার পর জিজ্ঞাসা করলেন—ওটা কি আমার স্বপ্ন ?

দিলীপ বললো—আমার তা মনে হয় না।

—কি মনে হয় তোমার ?

—যা মনে হয় সে কথা এখন না-ই বা শুনলেন। দেখা যাক ঘটনার গতি কোন দিকে যায়।

www.boiRboi.blogspot.com

পাঁচ

খাওয়াদাওয়ার পর সোমপ্রকাশ দিলীপকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন।

খাটের ওপর বসলেন দুজনে।

তারপর দিলীপের সাহায্য প্রত্যাশা করে কলকাতা থেকে এখানে রওনা হওয়ার আগে ত্রিদিবের হাতে চিঠিটা রেখে দেওয়ার কারণ বলতে শুরু করলেন।

ভুজঙ্গনারায়ণ ওঁর পুরানো মক্কেল। বছর পাঁচেক আগে ভুজঙ্গনারায়ণ পুরানো উইল বদলে নতুন উইল তৈরী করেছিলেন, এবং সে উইলে সোমপ্রকাশকে সাক্ষী হিসাবে সই করতে হয়েছিল।

উইল তৈরী হওয়ার পর ভুজঙ্গনারায়ণ সোমপ্রকাশের কাছে এক অদ্ভুত প্রস্তাব করেছিলেন। বলেছিলেন, উনি মারা গেলে ওঁর মৃত্যু-সংবাদটা যেন কলকাতার সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয় এবং সংবাদপত্রে ওঁর ছেলেদের অনুরোধ করা হয়, যেন ওরা ওদের বাবার উইলের সারমর্ম শুনতে মায়া-মঞ্জিলে জমায়েত হয়!

ওঁর সে প্রস্তাবে সোমপ্রকাশের গররাজী হওয়ার কোন কারণ থাকে না।

এককালে ভুজঙ্গনারায়ণ ছিলেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার। দয়া-মায়াহীন দুরাচারী। ওঁর নানারকম লোমহর্ষণ কুকীর্তির জন্য জমিদারির প্রত্যেকে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে দিন কাটাত।

ওঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার ফলে নাকি

মহালের কোন এক জায়গায় তৈরী সূর্যালোকবিহীন অন্ধ পাষাণপুরীতে তাকে বন্দিনী করে রেখে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করেছিলেন।

প্রথম পক্ষের স্ত্রীর চার ছেলে ছিল। তারাই হচ্ছে ঃ পরিতোষ, মহীতোষ, সন্তোষ এবং অনুতোষ।

মায়ের রহস্যজনক অন্তর্ধানের পর ভুজঙ্গনারায়ণের কাছ থেকে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত না পেয়ে তারা ভুজঙ্গনারায়ণের সঙ্গে ঝগড়া করে। পিতার প্রতি হীন মন্তব্য করতেও দ্বিধাবোধ করে নি।

ভুজঙ্গনারায়ণের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। মনের ভিতরকার পশু-প্রবৃত্তিটা চঞ্চল হয়ে ওঠে। দারোয়ান ডেকে তাদের তাড়িয়ে দেন মায়া-মঞ্জিল থেকে।

কোন প্রতিবাদ করে না ভাই-চারজন। মাথা নীচু করে জমিদারি ছেড়ে চলে যায়।

পরের মাসেই মায়া-মঞ্জিলে সানাই বেজে ওঠে। ঝাড়-বাতির উজ্জ্বল আলোয়, আতরের গন্ধে, বেশ-ভূষায় বর্ণ-বৈচিত্র্য এবং হাস্য-পরিহাসে সমস্ত বাড়িটা সরগরম হয়ে উঠে।

ভুজঙ্গনারায়ণ আবার বিয়ে করলেন।

দিন চলল। চলল ঋতুদের চক্রের ন্যায় পরিক্রমণ।

দেড় বছর পরে ভুজঙ্গনারায়ণের এক পুত্র-সন্তান জন্মগ্রহণ করল। সন্তানের নাম রাখা হলো কুণাল।

সাতবছর পরে ভুজঙ্গনারায়ণ এক বৃষ্টি-ঝরা রাত্রে কুণালের দু'হাতের তালুতে গজিয়ে ওঠা পুরু পুরু কালো চুল আবিষ্কার করলেন।

একটা তীব্র সন্দেহ ওঁর মাথায় খেলে গেল। কুণালের সামনেই স্ত্রীকে সেই সন্দেহটা জানালেন। কিন্তু ওঁর দ্বিতীয় পক্ষের বিদুষী স্ত্রী কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বিষয়টা ভুজঙ্গনারায়ণের মনের মধ্যে চাপা পড়ে গেল।

এরপর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কুণাল মাংস আহারের প্রতি আসক্ত হয়ে উঠল।

পনেরো বছর পরে এক শীতের সন্ধ্যায় মায়া-মঞ্জিলের বৈঠকখানায় ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হলো মহীতোষ রায়। ভুজঙ্গনারায়ণের সঙ্গে দেখা করে ও জানালো: এখান থেকে বিদায় নেওয়ার পর পুনায় গিয়ে জালিয়াতদের কবলে পড়ে। সেখানে নিজের বুদ্ধি ও কর্মক্ষমতা দেখিয়ে দলের সর্দার হয়। তারপর পাঁচবছর পরে প্রমাণ সমেত পুলিসের হাতে ধরা পড়ে এবং দশ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এখন জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ভুজঙ্গনারায়ণের কাছে ফিরে এসেছে সন্তানের দাবি নিয়ে।

সব শুনে ভুজঙ্গনারায়ণ এগিয়ে এসে খপ করে মহীতোষ রায়ের চুলের মুঠি ধরলেন—অবরুদ্ধ ক্রোধে ফেটে পড়ে প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে দিলেন ওর গালে।

মহীতোষ রায় ছিটকে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। খানিক পরে যখন ও উঠে দাঁড়াল, তখন ওর দু'চোখে তীব্র আগুন জ্বলে উঠেছে। মায়া-মঞ্জিল থেকে চলে যাওয়ার আগে ভুজঙ্গনারায়ণকে শাসিয়ে গেল এই বলে যে, ওঁর সুখের সংসারে ও আগুন ধরিয়ে দেবে।

কথাটা দু' সপ্তাহের মধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে ফলল। এক সকালে দেখা গেল কুণালের মায়ের বুকে বিঁধে রয়েছে বাঁকানো একখানা ছোরা।

কেলেঙ্কারির ভয়ে অজস্র অর্থব্যয়ে সমস্ত ব্যাপারটা চেপে দিলেন ভুজঙ্গনারায়ণ। তবে উনি বেশ বুঝতে পারলেন যে, একাজ একমাত্র মহীতোষ ছাড়া আর কারো হতে পারে না।

কুণালও ভুজঙ্গনারায়ণের মনের কথা জানতে পারলো।

স্ত্রী নিহত হওয়ার পর ভুজঙ্গনারায়ণ কেমন যেন মনমরা হয়ে গেলেন। প্রতি সপ্তাহে কলকাতায় গিয়ে ঘোড়-দৌড়ের মাঠে পিতৃ-পুরুষের সঞ্চিত অর্থরাশি নিঃশেষ করে আসতে লাগলেন। ক্রমে হিংস্র হয়ে উঠলেন ভয়ংকর ভাবে।

কুণাল ওঁকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করত। কিন্তু ওঁর দিনরাত বাক্যবাণ শুনে শুনে ওর ভক্তি-শ্রদ্ধার ভিতে ফাটল ধরল।

একদিন ভুজঙ্গনারায়ণের বাক্যবাণ সহ্য করতে না পেরে কুণাল সরাসরি প্রতিবাদ জানালো।

ভুজঙ্গনারায়ণ হিংস্র হয়ে উঠলেন গুলি খাওয়া ব্যাঘ্রের মত। পুরানো সন্দেহটা ওঁর মস্তিষ্কের ভেতরটা জ্বালিয়ে দিলো। ক্রোধে অপমানে থরথর করে কাঁপতে লাগলেন উনি। অমানুষিককণ্ঠে চিৎকার করে বললেন—তুই যে একদিন না একদিন আমার কথা সহ্য করতে পারবি না, তা আমি তোর হাতের তালুর মোটা মোটা কালো চুল দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। তুই নেকড়ে বাঘের মন নিয়ে জন্মেছিস। এখানে এক মুহূর্তও তোকে আর আমি রাখতে রাজী নই। শেষে তুই হয়ত আমার টুঁটি ছিঁড়ে রক্ত খেতে পারিস। যা দূর হয়ে যা—

চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ল কুণালের। সারা মুখে একটা রক্তাভ জ্বালার দীপ্তি নিয়ে কুণাল সেই মায়া-মঞ্জিল ছেড়ে চলে গেল, স্বপনপুরের কেউ আর তারপর থেকে ওকে দেখতে পেলো

না। কয়েকমাস পরে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভুজঙ্গনারায়ণ জানতে পারলেন, কুণাল কলকাতার এক থিয়েটারে চাকরি পেয়েছে অভিনেতা হিসাবে।

বিশ বছর পরে ভুজঙ্গনারায়ণ যখন নিজের ভুল বুঝতে পারলেন, তখন সেই থিয়েটারের উদ্দেশ্যে ছুটলেন কুণালকে মায়া-মঞ্জিলে ফিরিয়ে আনবার জন্য।

কিন্তু কুণাল সেখানে ছিল না, মাসখানেক আগে থিয়েটারের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল।

হতাশায় ভেঙে পড়লেন ভুজঙ্গনারায়ণ।

তারপর ওঁর পরিবর্তন হলো। কুণালের শোকে উনি একেবারে ভেঙে পড়লেন—একটু মস্তিষ্ক বিকৃতিও ঘটল। কুণালকে যে এত বেশী ভালবাসতেন, তা আগে উনি টের পাননি।

কয়েকদিন পরে উনি সোমপ্রকাশকে মায়া-মঞ্জিলে আসবার জন্য 'তার' করলেন। সোমপ্রকাশ এলে উনি পুরানো উইল পালটে নতুন উইল করবার বাসনা জানালেন। শেষে উইল তৈরী হয়ে গেলে এই অদ্ভুত প্রস্তাবটার কথা বললেন সোমপ্রকাশকে।

ভুজঙ্গনারায়ণের সম্পত্তি বলতে তখন কিছুই ছিল না। সম্পত্তিটা এখান থেকে আট মাইল দূরের কাপড়ের আড়তদার চৌধুরীরা কিনে নিয়েছিল। ভুজঙ্গনারায়ণের নিজের বলতে ছিল ব্যাঙ্কে মজুত বাইশ হাজার টাকা এবং এই মায়া-মঞ্জিলটা। পাইক-বরকন্দাজ নায়েব মুহুরিরা তখন বিদায় নিয়েছিল একে একে।

মায়া-মঞ্জিলের মর্মান্তিক নীরবতার মাঝে মুরারীমোহনকে নিয়ে ভুজঙ্গনারায়ণ জেগে রইলেন দুঃস্বপ্নের মত।

প্রাত্যহিক ঘূর্ণায়মান দিনগুলো ছায়াছবির মত চলে যেতে লাগল।

সোমপ্রকাশ যখন থামলেন, তখন গোধূলির ভাঙা মেঘে অস্তমিত সূর্য লালে লাল হয়ে উঠেছে।

খোলা জানলা দিয়ে দৃষ্টিটা বাইরের দিকে মেলে দিতে দিলীপ দেখতে পেলো মুরারীমোহন ফটক পেরিয়ে ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে মায়া-মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে আসছে।

দৃষ্টিটা সেদিক থেকে সরিয়ে এনে দিলীপ সোমপ্রকাশের মুখের পানে কেন্দ্রীভূত করল। চিন্তান্বিত মুখে বলল—কলকাতায় আমার নামে চিঠি লিখে ত্রিদিবের কাছে রেখে দেওয়ার কারণটা বললেন না তো কাকাবাবু?

হাতের তালু দিয়ে কপালটা বুলিয়ে নিয়ে সোমপ্রকাশ বললেন—সত্যি কথা বলতে কি ভুজঙ্গনারায়ণের মৃত্যুর পর আমি ভীষণ ভয় পেয়েছিলাম। ভুজঙ্গনারায়ণের কথামত সংবাদপত্রে ওঁর মৃত্যুসংবাদ এবং সেই সঙ্গে ওঁর ছেলেদের মায়া-মঞ্জিলে ফিরে আসবার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। সপ্তাহখানেক পরে ওঁর প্রথম পক্ষ ছেলেদের কাছ থেকে জবাব পেয়েছিলাম। ওরা জানিয়েছিল, সংবাদপত্রে বিষয়টা জানতে পেরে মায়া-মঞ্জিলের পানে ওরা রওনা হচ্ছে। ওদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য কলকাতা থেকে ভজহরি নামে আমার জানাশুনা একজন ব্রাহ্মণ পাচককে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর এখানে নিজের আসবার কথা মনে হতেই আঁতকে উঠেছিলাম।

—কেন? দিলীপ প্রশ্ন করল।

সোমপ্রকাশ বললেন—তুমি হয়ত জানো না দিলীপ, সন্তোষ

সোনা চোরা-চালানের অপরাধে পাঁচবার জেল খেটেছে। পরিতোষ নরঘাতী। তাই ওদের মাঝে থেকে নিজের জীবন বিপন্ন হতে পারে ভেবে তোমার সাহায্য চেয়েছিলাম।

—আপনি কি কাল সকালের ট্রেনে এখানে এসেছিলেন ?

—হ্যাঁ।

—একটা কথা কাকাবাবু, পাঁচবছর আগে আপনি যখন এখানে এসেছিলেন, তখন মুরারীমোহনকে এখানে দেখেছিলেন ?

—না, ও সেদিন কোথায় যেন গিয়েছিল।

দিলীপ মুখ নীচু করে কী যেন ভাবতে লাগল।

—অ্যাটর্নিবাবু। মুরারীমোহন কখন যে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তা ওদের খেয়াল ছিল না।

মুরারীমোহনের ডাকে সোমপ্রকাশ মুখ তুললেন। তাকালেন মুরারীমোহনের দিকে। মুরারীমোহন বলল—সন্ধ্যের পর থানা থেকে দারোগাবাবু আসবেন।

সোমপ্রকাশের চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠল।

ছয়

সাড়ে সাতটায় ঘোড়া ছুটিয়ে দারোগা অবিনাশ বসাক মায়া-মঞ্জিলে এলেন।

দিলীপকে নিয়ে সোমপ্রকাশ বৈঠকখানায় ওঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

ঘোড়া থেকে নেমে অবিনাশ বসাক বৈঠকখানায় এলেন। সোমপ্রকাশ আত্মপরিচয় দিয়ে অবিনাশ বসাককে অভ্যর্থনা করলেন। তারপর দিলীপের সঙ্গে ওঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

একখানা চেয়ার অধিকার করে অবিনাশ বসাক আপ্যায়নে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন—কী সৌভাগ্য আমার। আপনার মত স্বনামধন্য সত্যান্বেষীর দেখা পাবো, আশা করিনি মিস্টার সান্যাল। কবে এলেন?

দিলীপ বলল—আজ সকালে।

—কী ব্যাপার বলুন তো?

সোমপ্রকাশ বিষয়টা জানালেন। শুনে অবিনাশ বসাকের মুখখানা অসম্ভব রকমের গম্ভীর হয়ে উঠল। নাসা বিস্ফারিত করে বললেন—চলুন লাশটা এবার দেখে আসা যাক।

ভুজঙ্গনারায়ণের শয়নকক্ষে এসে পরিতোষ রায়ের মৃতদেহ দেখে অবিনাশ বসাকের তামাটে মুখখানার ওপর দিয়ে সংশয়ের একটা নিবিড় ছায়া ছড়িয়ে পড়ল। চোখ দুটোকে হঠাৎ সংকুচিত করে এনে বললেন—মৃতদেহের গলাটা খেয়ে ফেলা হয়েছে মনে হচ্ছে।

ভীত বিমূঢ় সোমপ্রকাশের বুকের রক্ত হিম হয়ে এলো। অর্ধস্ফুট-কণ্ঠে বলে উঠলেন—কী বললেন মিস্টার বসাক ?

—মৃতদেহের গলাটা খাওয়া খাওয়া মনে হচ্ছে। একাজ কোন মানুষের হতে পারে না।

—তবে কার ?

—কোন রক্তশোষক জানোয়ারের।

—সে কি। তীক্ষ্ণ তীব্র একটা আর্তধ্বনি সোমপ্রকাশের গলার মাঝপথে এসে থেমে গেল।

আবার বৈঠকখানায় ফিরে এলেন তিনজনে। তিনখানা চেয়ার অধিকার করলেন।

অবিনাশ বসাক জানতে চাইলেন, এ বাড়িতে এখন কে কে আছেন ?

সোমপ্রকাশ বললেন—নিহত ব্যক্তি বাদে এখানে বর্তমানে আছেন তিনি নিজে, দিলীপ সান্যাল, পাচক ভজহরি, চাকর মুরারীমোহন এবং ভুজঙ্গনারায়ণের তিন পুত্র মহীতোষ, সন্তোষ ও অনুতোষ।

প্রথমে ডাক পড়ল ভজহরির।

দ্বিধাগ্রস্তের মত মিটমিট করে চারিদিক তাকাতে তাকাতে ভজহরি এলো।

মিশকালো ওর গায়ের রঙ। মোটাসোটা ওর চেহারা। কর্কশ মুখে দাড়িগোঁফ আর অবিন্যস্ত চুলের প্রাধান্য।

অবিনাশ বসাকের প্রশ্নে ভজহরি জানালো: দু' সপ্তাহ আগে কলকাতার শোভাবাজারের ব্রাহ্মণ পাচক পটিতে গিয়ে সোমপ্রকাশ

www.boiRboi.blogspot.com

একমাসের মাইনে অগ্রিম দিয়ে ওকে এখানে পাঠান। সেই থেকে ও এখানে আছে।

অবিনাশ বসাক বললেন—কাল রাত্রে কোন অস্বাভাবিক চিৎকার শুনতে পেয়েছিলে?

ভজহরি আতঙ্কিতের মত দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত করল—না তো!

ওকে যেতে নির্দেশ দিলেন অবিনাশ বসাক।

এর পর এলো মহীতোষ রায়।

কুৎসিত মুখের চেহারা ওর। সচল পাহাড়ের মত বিপুল দেহ, কঠিন পেশী। ভয়ংকর চোখের দৃষ্টি—যেন ক্ষুধিত অজগরের লোলুপতা মাখানো। বাঁ গালের পরে দু'ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষতচিহ্ন।

ভজহরির কথারই পুনরাবৃত্তি করে মহীতোষ রায় বলল, গতরাত্রে ও কোন চিৎকার শুনতে পায়নি।

ও চলে গেলে ভারিক্কীচালে প্রবেশ করল সন্তোষ রায়।

সুশ্রী, বজ্রের মত শক্তিশালী দীর্ঘ চেহারা। নাকটা অসম্ভব রকমের উঁচু। পরনে ঢোলা পায়জামা ও ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি।

অবিনাশ বসাক প্রশ্ন করলেন—কাল রাত্তিরে এ বাড়ি থেকে কোন আর্তনাদ বা চিৎকার আপনার কানে গিয়েছিল?

—না।

—আচ্ছা সন্তোষবাবু, কতদিন আগে আপনারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন?

—তা প্রায় বছর তিরিশ আগে হবে। সন্তোষ রায়ের ভ্রূ বেঁকে গেল বিরক্তিতে।

—আপনার বাবা আপনাদের সন্ধান রাখতেন?

—না।

—আচ্ছা আপনি এখন যেতে পারেন।

—যাচ্ছি।

সন্তোষ রায়ের কণ্ঠের অস্বাভাবিকতায় সোমপ্রকাশ চমকে উঠলেন।

শেষে অনুতোষ রায়কে সোমপ্রকাশ ডেকে নিয়ে এলেন। অনুতোষ রায়ের মুখের কমনীয় রেখা মুছে গিয়ে সেখানে অনমনীয় দৃঢ়তা ফুটে উঠেছিল।

অবিনাশ বসাক বললেন—একটা কথা জানবার জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি অনুতোষবাবু।

—বলুন। অনুতোষ রায়ের গালের মাংসপেশীর কুঞ্চন দেখা গেল।

শান্ত গলায় অবিনাশ বসাক বললেন—তিরিশ বছর আগে আপনারা এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে কি আপনার কোন যোগাযোগ ছিল?

—না, কলকাতায় গিয়ে আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলাম।

অবিনাশ বসাকের ঠোঁট চেপে গেল, মুখখানা কঠিন হয়ে এলো; বললেন—শুনলাম, আপনার বর্তমান নাম নাকি বিশ্বম্ভর হাজরা?

হঠাৎ যেন একটা ঝাঁকুনি খেল অনুতোষ রায়, সমস্ত রক্ত যেন সরে গেল মুখ থেকে; আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—কে বলল আপনাকে?

অবিনাশ বসাক বললেন—মিস্টার সান্যাল বলেছেন।

—হ্যাঁ, আমার এখনকার নাম বিশ্বম্ভর হাজরা। তবে ও নামটা

www.boiRboi.blogspot.com

আমার আসল নয়। কথা বলতে গিয়ে অনুতোষ রায়ের অধরোষ্ঠ কেঁপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে শক্ত করে নিয়ে বলল—আমার আসল নাম অনুতোষ রায়। হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমার আসল নাম অনুতোষ রায়।

—তার কোন প্রমাণ দিতে পারেন?

—তা অবশ্যি পারি না। কারণ তিরিশ বছর আগে দাদাদের কাছ থেকে সঙ্গছাড়া হয়ে গিয়েছিলাম। এখন আমাকে ওদের চিনতে না পারাই স্বাভাবিক।

একটা কুটিল সন্দেহে অবিনাশ বসাকের মন আচ্ছন্ন হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ধারালো কণ্ঠে বললেন—কিন্তু আমি যদি বলি, সাড়ে আট বছর আগে এখান থেকে চলে যাওয়া কুণাল রায়ই হচ্ছেন আপনি তাহলে?

—আমি কুণাল রায়? কুণ্ঠিত বিস্ময়ে একটা ঢোক গিলে অনুতোষ রায় নাকটা কুঁচকোয়। কেমন যেন বিশীর্ণ হাসি হাসে। পরমুহূর্তে ভয়ে বিস্ময়ে ওর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে যেন কোটর থেকে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হয়। আর্তনাদের কণ্ঠে বলে ওঠে—কুণালের মন হচ্ছে নেকড়ে বাঘের মন। মানুষের মূর্তি নিয়ে ও এ জগতে এসেছে।

অবিনাশ বসাক চোখ দুটো কুঁচকে প্যাঁচার মত ছোট করে এনে বলে উঠেন—আপনি কি করে জানলেন?

—এ বাড়ির ওপরে একটা মায়া ছিল বলেই সবকিছু জানতে আমার কষ্ট হতো না। কুণালের দু'হাতের তালুতে কালো কালো মোটা চুল জন্মেছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

তীরের মত সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ান অবিনাশ বসাক, ওঁর মুখ বরফের মত সাদা হয়ে যায়। ব্যগ্রকণ্ঠে বলেন—না-না এ অসম্ভব। বিজ্ঞানের যুগে আপনার এই আজগুবি কথা শুনতে আমি মোটেই রাজী নই।

মিষ্টি হেসে অনুতোষ রায় সবিনয়ে বলে—এটা মোটেই আজগুবি ব্যাপার নয়। ওই কারণেই বাবা ওকে এখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

অবিনাশ বসাকের চাপা ঠোঁটের ভেতর দিয়ে একটা গম্ভীর আওয়াজ বেরিয়ে আসে—হুম!

www.boiRboi.blogspot.com

—সাত—

পালকি-বেহারাদের আবার ডেকে পাঠানো হলো।

মৃতদেহ পালকির মধ্যে চাপিয়ে বেহারারা গুঞ্জনধ্বনি তুলে বেরিয়ে গেল মায়া-মঞ্জিল থেকে।

অবিনাশ বসাক ঘোড়া ছুটালেন। থানায় গিয়ে সেখান থেকে উনি ময়না-তদন্তের জন্যে মৃতদেহটা মর্গে পাঠাবার বন্দোবস্ত করবেন।

রাত্রি সাড়ে ন'টায় মায়া-মঞ্জিলের সকলের নৈশ-আহার শেষ হয়ে গেলে একে একে বৈঠকখানায় এসে হাজির হোলো। চেয়ারগুলো অধিকার করলো সকলে। মুরারীমোহন ও ভজহরি পেছনে দাঁড়িয়ে রইল।

সোমপ্রকাশ ভুজঙ্গনারায়ণের শয়নকক্ষের আয়রন-সেফ খুলে উইলটা নিয়ে সবশেষে ঘরে ঢুকলেন। দেখলেন: দিলীপ, মহীতোষ, সন্তোষ এবং অনুতোষ চেয়ারের 'পরে পাষাণ-মূর্তির মত বসে রয়েছে। ওদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে মুরারীমোহন ও ভজহরি।

অবিনাশ বসাক চলে যাওয়ার পরেই উনি উইল পড়ার কথাটা জানিয়েছিলেন।

একখানা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে সোমপ্রকাশ বসলেন। একটা চুরুট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া মুখ থেকে উদ্গীরণ করে বললেন—এবার তাহলে যেজন্য তোমাদের এখানে জমায়েত হতে বলেছিলাম, সেটা বলা যাক।

পকেট থেকে উইলটা বের করলেন। কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললেন—ভুজঙ্গনারায়ণ আমার মক্কেল হলেও আমার বিশেষ বন্ধু ছিল। ওর উইলে সাক্ষী হিসাবে আমাকে সই করতে হয়েছিল। আমি পাঁচ বছর আগে থেকেই উইলের সারমর্ম জানতাম। তবে ভুজঙ্গনারায়ণ আমাকে বলেছিল, যথাসময়ে অর্থাৎ কিনা উইল পড়ার আগে পর্যন্ত উইলের সারমর্ম আমি যেন কাউকে না জানাই। এবার উইলটা পড়ি, কী বলো!

ফুলস্কেপ সাইজের কাগজের ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরলেন সোমপ্রকাশ। তারপর গলার স্বরটা একটু উঁচুতে তুলে ধরে পড়তে লাগলেন ঃ

আমি ভুজঙ্গনারায়ণ রায় সজ্ঞানে ও সুস্থমনে এই উইল করছি। আগের উইলে আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর চার ছেলেকে আমার মৃত্যুর পর সঞ্চিত অর্থ ও মায়া-মঞ্জিল সমান ভাগে দেওয়ার যে বিষয়টা লিখেছিলাম, তা এই নতুন উইলে বাতিল করে দিলাম। কেন না, একমাত্র এই উইলই আমার মৃত্যুর পর কার্যকরী হবে। আমার অবর্তমানে আমার সমস্ত সঞ্চিত অর্থ ও মায়া-মঞ্জিলের মালিকানা স্বত্ব আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর পুত্র কুণাল রায়ের ওপর বর্তাবে। ইতি—

সোমপ্রকাশ থামলেন।

—কুণাল রায়! দিলীপের মুখ থেকে কথাটা বেরিয়ে আসে আচমকা।

সোমপ্রকাশ সংযত কণ্ঠে বলেন—হ্যাঁ। ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখা বাইশ হাজার টাকা আর এই মায়া-মঞ্জিলের মালিক এখন কুণাল রায়।

—ফুঃ!—ওর কথাটা দাঁতের ফাঁক দিয়ে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে মহীতোষ রায় বলে—তার মানে আমরা ভেসে গেলাম।

সমবেদনার ঠাণ্ডা গলায় সোমপ্রকাশ বলে—তার আমি কি করব বলো মহীতোষ! তোমার বাবা যা ভালো বুঝেছিলেন তাই করেছিলেন।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় সন্তোষ রায়, স্পর্ধিত দৃষ্টিতে বলে—তাহলে অনর্থক খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?

সোমপ্রকাশ বলেন—তোমার বাবার ইচ্ছাটা আমি পূরণ করেছি মাত্র। আমাকে দোষ দেওয়ার মত এতে কিছু নেই।

—আমি একদণ্ডও এখানে থাকতে রাজী নই!

—কিন্তু অবিনাশ বসাকের নিষেধ আছে। এখান থেকে তোমার এখন যাওয়া হতে পারে না।

—মানে?

—মানে পরিতোষের মৃত্যু-রহস্যটা আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কেউ এখান থেকে এক পাও নড়তে পারব না।

নিষ্ফল আক্রোশে একটা গর্জন করে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল সন্তোষ রায়।

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা!

দিলীপ চিন্তায় ডুবে গেল।

এদের মধ্যেই রয়েছে পরিতোষ রায়ের আততায়ী! কিন্তু কে সে?

—দিলীপ!—সোমপ্রকাশ মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চোখ তুলল দিলীপ!

সোমপ্রকাশ বললেন—আমার মনে হয় দিলীপ, নিশ্চয় তুমি মধ্য ইওরোপের রক্তশোষক বাদুড়ের ইতিহাসটা জানো ?

দিলীপ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

—আমিও সেই সম্পর্কেই ভাবছি। মহীতোষ রায় ভ্রু-যুগল কুঁচকে বলে উঠল—আমার মনে হয় সে ইতিহাস আমাদের মধ্যে হয়ত সকলেই জানে। তবে অবশ্যি কেউ বিশ্বাস করে না। কিন্তু আমাদের মাঝে এমন একজন আছে, যে সেকথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে।

মেঘ-মন্থর কণ্ঠে দিলীপ বলল—কে সে ?

—আমি।—মহীতোষ রায়ের চোখে ফুটে উঠল অদ্ভুত এক হিংস্র আভা। যথাসম্ভব নরম গলায় বলল—হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি। বড়দার ছেঁড়া গলা দেখেই আমি আন্দাজ করে নিয়েছিলাম। রক্ত-শোষক বাদুড়ই যে বড়দার গলা ছিঁড়ে রক্তপান করে তাঁকে হত্যা করেছিল, একথা আমি হলপ করে বলতে পারি।

চেয়ারের হাতলে একটা ঘুসি মেরে সন্তোষ রায় চেঁচিয়ে উঠল—অসম্ভব। এ অন্ধ বিশ্বাস আমি মানি না। ইন্দ্রজাল প্রভাবে বা স্বেচ্ছায় নেকড়ে মূর্তিধারী মানুষের ইতিহাসের মতই রক্তশোষক বাদুড়ের ইতিহাসও একটা প্রাচীন গল্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার নীরবতা।

বাইরে শব্দহীন রাতটা জমাট বেঁধে গেছে শোকাচ্ছন্ন রাত্রির হৃৎ-পিণ্ডের মত।

স্বভাবকর্কশ ভয়ংকর সুরে মহীতোষ রায় বলল—তোমার বক্তব্য যদি ওই হয়, তাহলে একটা সত্য ঘটনা শোনো। বছর দশেক

আগে এক সময়ে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। আমি হাওয়া বদলের জন্য কার্সিয়াং-এ যাই। সেখানে ঘটনাটা জানতে পারি। এক ইংরেজ ভদ্রলোক কার্সিয়াং থেকে সাত মাইল দূরে চা-বাগানের মালিক ছিলেন। উনি ভীষণ অত্যাচারী আর কৃপণ স্বভাবের ছিলেন। একদিন মোটর দুর্ঘটনায় উনি মারা যান। পাদরীর অনুগ্রহ ছাড়াই ওঁকে কবর দেওয়া হয়। কেন না, বরাবরই গির্জা সম্পর্কে ওঁর একটা বিরূপ ধারণা ছিল এবং পাদরীর দেখা পেলেই উনি তাঁদের ইতর ভাষায় অপমান করতেন।

দম নেওয়ার জন্য মহীতোষ রায় চুপ করল।

সকলের মুখে শীতল স্তব্ধতা, কপালের রেখাগুলো একটা অজানা আতঙ্কে সরীসৃপের মত সর্পিল হয়ে উঠেছে—স্ফীত হয়ে উঠেছে বুকের শিরা-উপশিরাগুলো।

—সে ভদ্রলোক কিন্তু আসলে মারা যাননি। মহীতোষ রায় আবার শুরু করে: ওঁর দেহের মৃত্যু ঘটেছিল বটে কিন্তু আত্মা শান্তি পায়নি। অমাবস্যার রাত যখন গভীর হয়ে যেত, তখন উনি কবর ফুঁড়ে জেগে উঠতেন। কিছুদিন পরে সেখানকার চা-বাগানের এক কুলি দীর্ঘদিন রোগে ভুগে মারা গেল। কুলির মৃতদেহ সৎ-কারের জন্য আত্মীয়স্বজন ওকে এক নির্জন জায়গায় নিয়ে গেল। সেদিন ভরা-অমাবস্যা। আত্মীয়স্বজন কুলির মৃতদেহ ছেড়ে সৎকারের জায়গায় কাঠ সাজাতে মন দিল। তারপর যখন তারা সৎকারের জন্য মৃতদেহটা নিতে এলো, তখন বিস্ময়ে আর ভয়ে পালাল সেখান থেকে। কুলির দেহটা যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়েছিল।

দিলীপ সকলের দিকে একবার করে তাকিয়ে নিল। সন্তোষ,

অনুতোষ, মুরারীমোহন এবং সোমপ্রকাশের চোখে বিস্ময় বোধের উজ্জ্বলতা ফুটে উঠেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে মহীতোষ রায়ের মুখের দিকে। মহীতোষ রায়ের দু'চোখে যেন হিপনোটাইজ করবার নির্নিমেষ খরতা জ্বলছে।

জানালার বাইরে জ্বলছে অজস্র জোনাকি, ভূতের চোখের মত। ঘরের মধ্যে সিলিংয়ের বেলোয়াড়ী ঝাড়-বাতির ম্রিয়মাণ আলোয় চারিদিক যেন ভয়ংকর হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে হাওয়ায় বাতিগুলো কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকে।

স্থিরপ্রজ্ঞের গাম্ভীর্য নিয়ে মহীতোষ রায় বলে চলে—তারপর সেই চা-বাগানের কুলিবস্তিতে এক রক্তশোষক বাদুড়ের আবির্ভাব হয়। এক ভোরে এক কুলি রমণীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। ওর টুঁটিটা ছেঁড়া, দেহের সমস্ত রক্ত শুষে নেওয়া হয়েছিল। পরদিন রাত্রে একটা দশ এগারো বছর বয়সের ছেলের সেই একই অবস্থায় মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। তারপর পুলিসে সংবাদ পাঠানো হয়। দার্জিলিং থেকে বিখ্যাত প্রেত-তত্ত্ববিদ্ মানমোহন সামন্ত সেখানে যান।

—তারপর ? কম্পিতকণ্ঠে সোমপ্রকাশ প্রশ্ন করে ওঠেন আচমকা।

মহীতোষ রায় বলে—বিষয়টা বুঝতে পেরে কয়েকজন পুলিস নিয়ে মানমোহন সামন্ত মুরগি ডাকার দশ মিনিট পরে সেই কৃপণ ইংরেজ ভদ্রলোকের কফিন তুলে খোলেন। মৃত ব্যক্তির বুকে বড় বড় পেরেক গেঁথে দেওয়া হয়, মাথাটা থেঁতলে দেওয়া হয় কাঠের হাতুড়ি দিয়ে।

থেমে যায় মহীতোষ রায়। রুমাল বের করে মুখখানা মুছে নেয়।

দিলীপ বলে—যে কুলীটির লাশ অদৃশ্য হয়েছিল, তার কী হলো ?

—লাশটা পরের দিন আগের জায়গাতেই পাওয়া যায়। সেটাকে

ইংরেজ ভদ্রলোক চুরি করে তার মধ্যে নিজের আত্মাকে প্রবেশ করিয়ে উনি রক্তশোষক বাদুড়ে পরিণত হয়েছিলেন।

—বাদুড় না ছাই। যত সব আজগুবী গল্প! সন্তোষ রায় মুখ ভেঙচায়।

উত্তেজনায় মহীতোষ রায়ের হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে, রক্ত ফেটে পড়তে চায় চোখের তারা থেকে।

কোন কথা বলে না।

সন্তোষ রায় উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আমি চলি, আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে।

সোমপ্রকাশ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে, ও ঘর থেকে প্রস্থান করে। একটা থমথমে গুমোট ভাব ছেয়ে ফেলে ঘরখানাকে।

—মেজদা, একটা কথা বলব? কুণ্ঠিত মুখে অনুতোষ বলে।

স্বভাবসিদ্ধ তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকায় মহীতোষ—কী বলবে বলো।

জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে অনুতোষ বলে—একটু আগে ইন্দ্রজাল প্রভাবে নেকড়ে-মূর্তিধারী মানুষের যে কথা বলেছিলে, তারাও কি জীবন্ত প্রাণীর টুঁটি ছিঁড়ে রক্ত পান করে?

—হ্যাঁ, নেকড়ে-মূর্তিধারী মানুষেরা হচ্ছে অর্ধেক নেকড়ে আর অর্ধেক মানুষ। পশুত্ব আর মনুষ্যত্ব ওদের মনে পাশাপাশি বাস করে। রক্তের ঘ্রাণ পেলেই ওরা ব্যাকুল হয়ে ওঠে রক্তপান করার জন্যে।

—ওদের হাতের তালুতে লোম জন্মায়, তাই না?

—হ্যাঁ, কালো চকচকে লোম। কিন্তু ইন্দ্রজাল প্রভাবে নেকড়ে মূর্তিধারী মানুষেরা নিজের জন্মস্থান ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না।

মহীতোষ রায় উঠে দাঁড়ায়। সকলকে শুভরাত্রি জানিয়ে প্রস্থান করে।

মুরারীমোহনও সোমপ্রকাশের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে চলে যায়।

যথোচিত মর্যাদা ও গাম্ভীর্য নিয়ে সোমপ্রকাশ অনুতোষ রায়ের দিকে তাকান।

শরাহত পাখির মত শঙ্কিত মুখ নিয়ে বসে রয়েছে অনুতোষ রায় পাষাণমূর্তির মত।

সোমপ্রকাশ উঠে দাঁড়িয়ে ওর কাছে এগিয়ে যান। মোলায়েম গলায় বলেন—এবার শোওগে যাও অনুতোষ। রাত হয়েছে।

—আচ্ছা।—প্রায় নিঃশব্দগলায় বলে অনুতোষ রায় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

সোমপ্রকাশ একটা চুরুট ধরান।

দিলীপ উঠে দাঁড়ায়। সোমপ্রকাশের মুখোমুখি হয়ে বলে—মহীতোষবাবুর গল্প কেমন লাগলো কাকাবাবু?

সীমাহীন তাচ্ছিল্যে তির্যক দৃষ্টিতে তাকালেন সোমপ্রকাশ। বঁড়শির মত বেঁকে যাওয়া ঠোঁট থেকে রাশি রাশি অবজ্ঞা ছড়িয়ে বললেন, যত সব অবাস্তব কাহিনী। মহীতোষের বক্তব্যটা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না।

হঠাৎ বিদ্যুতের মত ছুটে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল অনুতোষ রায়। ঠকঠক করে কাঁপছে, কণ্ঠে স্বর ফুটছে না।

দু'চোখে তীব্র সন্দেহ নিয়ে সোমপ্রকাশ বললেন—কী হয়েছে অনুতোষ? আবার ছুটে এলে কেন?

—আমি এখান থেকে এক্ষুনি চলে যেতে চাই। হাঁফাতে হাঁফাতে অনুতোষ রায় বলল।

—কেন কী হয়েছে?

—সে আপনি বুঝতে পারবেন না, আর বোঝাবার মত শক্তিও আমার নেই। আমি বাঁচতে চাই, মিষ্টার নাগ। এখানে থাকতে আমার ভীষণ ভয় করছে।

হঠাৎ দূর থেকে পুরুষ-কণ্ঠের চাপা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। মনে হয়, কে যেন বুক চাপড়ে কাঁদছে।

নিদারুণ বিভীষিকায় চমকে ওঠে অনুতোষ রায়—ওই শুনুন।

সোমপ্রকাশের মুখের ওপর দিয়ে শাণিত তরোয়ালের মত একটা বাঁকা হাসি ঝকঝক করে যায়। অনুতোষ রায়ের কাঁধের ওপর একটা হাত রেখে মোলায়েম গলায় বলেন—ও কিছু নয়। আজ তো আর ভয়ের কারণ নেই। দুপুরে ছুতোর মিস্ত্রী এসে সমস্ত শোয়ার ঘরেই খিল তৈরী করে দিয়েছে। কাল না হয় দিলীপকে থানায় পাঠিয়ে তোমার কথাটা মিস্টার বসাককে বলব'খন। উনি অনুমতি দিলে এখান থেকে চলে যেয়ো। এখন তোমার ঘরে গিয়ে দরজায় খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়োগে।

বুদ্ধিভ্রষ্টের মত অনুতোষ রায় কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখখানা ওর যেমন বিষণ্ণ, তেমনি পাণ্ডুর। এক সময়ে ক্লান্ত শিথিল পায়ে ঘর থেকে চলে যায়।

—ওকে আমার যেন কেমন কেমন মনে হচ্ছে, দিলীপ। সোমপ্রকাশ বলেন।

দিলীপ জিগ্‌গেস করে—অনুতোষবাবুকে আপনার সন্দেহ হয়।

—হ্যাঁ, চুরুটে কয়েকটা টান টেনে সেটা ফেলে দিয়ে পায়ের তলায় নির্মমভাবে পিষতে পিষতে সোমপ্রকাশ বলেন—দুবার যে লোক ব্যাঙ্ক ডাকাতি করেছে, তার এত সহজে ভেঙ্গে পড়াটা কি আশ্চর্যের নয় ?

দিলীপ বলে—তা বটে। যা হোক রাতটা একটু সাবধানে থাকবেন।

—কেন ?—সোমপ্রকাশের চোখে বিস্ময়, মুখে ভয়ের স্বাক্ষর ছাপ ফেলে।

দিলীপ গম্ভীর গলায় বলে—তার কারণ মহীতোষবাবুর কথাগুলোর একটা দিক্ আমি বিশ্বাস করি। যা রটে, তার খানিকটা তো বটে।

নির্মম বিদ্রূপের সুরে সোমপ্রকাশ বলেন—তুমিও কি শেষে···

কথাটা উনি শেষ করেন না।

দিলীপ একটু হেসে বলে—বললাম তো খানিকটা বিশ্বাস করি। আমার কথাটা ঠিক এখন উপলব্ধি করতে পারবেন না, তবে শিগগিরই সব কিছু জানতে পারবেন। আজ রাত্রিটা সতর্ক হয়ে থাকবেন, ঘুমোবেন না—এ বাড়িতে যে কোন মূহূর্তে কোন একজনের পরে মৃত্যু হয়ত নেমে আসতে পারে।

সোমপ্রকাশের যে অবয়বে এতক্ষণ বিরাজ করছিল শান্ত এবং সৌম্য গাম্ভীর্য, হঠাৎ সেখানে ফুটে ওঠে ভয়ে-বিহ্বল মানুষের নিদারুণ আতঙ্কগ্রস্ত বিভীষিকা!

www.boiRboi.blogspot.com

—আট—

দিলীপ দোতলায় উঠে নিজের ঘরে প্রবেশ করে।

বাতি জ্বালায়। দরজার কবাট দুটো ভেজিয়ে রেখে দেয়।

সুটকেস খুলে স্লিপিং-গাউনটা বের করে গায়ের ওপর চাপায়। পকেটের মধ্যে ভরে নেয় নিকষ কালো অটোমেটিক পিস্তল আর পেনসিল টর্চটা। ক্রেপ-রাবার সোলের জুতো-জোড়া পরে।

শেষে খাটের ওপর গিয়ে বসে পড়ে নিঃশব্দে।

ঘুমের তুহিনস্পর্শে সমস্ত মায়া-মঞ্জিলটা ততক্ষণে নিঝুম নিঃসাড় হয়ে গেছে। অমাবস্যার মত ক্ষীণ চাঁদ যেন অন্ধকারে গলে গলে নিঃশেষিত হয়েছে। কবরখানার মত থমথম করছে নির্বাক রাত্রি।

পর্দাতে ছবি আঁটার মত স্থির নিশ্চল হয়ে বসে থাকে দিলীপ। কান দুটো সজাগ হয়ে থাকে অভাবনীয়ের প্রতীক্ষায়।

সময় পেরিয়ে চলে। মুহূর্তগুলো দিলীপের স্নায়ুর ওপরে চাপ দেয় যেন।

ওর চিন্তাজর্জর মস্তিষ্কে গোলকধাঁধার মত পাক খেয়ে মহীতোষ রায়ের কথাগুলো ঘুরে বেড়ায়।

তবে কি এ বাড়িতে রক্তশোষক বাদুড়ের আবির্ভাব হয়েছে? অথবা ইন্দ্রজাল প্রভাবে নেকড়ে-মূর্তিধারী মানুষের?

অতল রহস্য!

সোমপ্রকাশের সন্দেহটাই কি তাহলে সত্যি। অনুতোষ রায়ই কি তাহলে নেকড়ে-মূর্তিধারী মানুষ?

কিন্তু কেন? কি কারণে? কী স্বার্থ আছে অনুতোষ রায়ের?

হতভাগ্য পরিতোষ রায় নিহত হল, অথচ সোমপ্রকাশের পকেটে চাবির রিং পাওয়া গেল। তবে কি সোমপ্রকাশই···?

কিন্তু সোমপ্রকাশই বা পরিতোষ রায়কে হত্যা করবেন কেন?

দুর্ভেদ্য রহস্য!

সংবাদপত্রের মাধ্যমে সোমপ্রকাশের অনুরোধে ভুজঙ্গনারায়ণের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর পুত্র-সন্তানেরা মায়া-মঞ্জিলে জমায়েত হল, অথচ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর একমাত্র পুত্র-সন্তান কুণাল রায় এল না কেন? তাহলে সে কী এখন আর বেঁচে নেই? অতৃপ্ত আত্মা নিয়ে এ-বাড়ির আশেপাশে রক্তশোষক বাদুড়ের মূর্তিতে পরিণত হয়ে বাস করছে?

কিন্তু ওর দু'হাতের তালুতে কালো কালো লোম ছিল। ও যে নেকড়ে-আত্মাধারী মানুষ, এই কারণেই তো ভুজঙ্গনারায়ণ ওকে এ-বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাহলে ও-ই কি রহস্যের মেঘনাদ? কিন্তু কোথায় ও? পরিতোষ, মহীতোষ, সন্তোষ আর অনুতোষ রায়ের মধ্যে কোন একজনই কি কুণাল রায়? কুণাল রায় যদি পরিতোষ রায়ের নাম নিয়ে এখানে এসে থাকে, তাহলে পরিতোষ রায়ের মৃত্যুরহস্যটা তো এই মুহূর্তে আবিষ্কৃত হতে পারে। কেননা, কুণাল রায় মারা গেলে মহীতোষ, সন্তোষ এবং অনুতোষ রায় ভুজঙ্গ-নারায়ণের বাইশ হাজার টাকা ও মায়া-মঞ্জিল হস্তগত করতে পারবে সমান অংশে।

কিন্তু কুণাল রায়ের সত্যিকারের পরিচয় মহীতোষ, সন্তোষ এবং অনুতোষ রায় জানতে পারল কি করে? আর কুণাল রায় যদি

পরিতোষ রায়ের রূপ নিয়ে থাকে, তাহলে আসল পরিতোষ রায় গেল কোথায় ?

গভীর চিন্তা আচ্ছন্ন করে দিলীপকে।

সমস্ত বিষয়টা যেমন চিন্তার, তেমনি ঘোরালো।

দেওয়াল বাতিটায় তেল না থাকায় বাতাসে হঠাৎ নিভে গিয়ে নিশ্চিদ্র আঁধারে সমগ্র ঘরখানা যেন দৃষ্টির থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এখনি হয়ত আত্মপ্রকাশ করবে রক্তশোষক বাদুড় কিংবা নেকড়ে মূর্তিধারা মানুষ ! অন্ধকারে কুটিল হিংসা সরীসৃপের মত দিলীপকে হয়ত ছোবল মারবার সুযোগ খুঁজছে।

অশরীরী ভৌতিক নিশ্বাসে আকীর্ণ ঘরের মধ্যে খাটের ওপর বসে থাকে দিলীপ। হঠাৎ চকিত বিদ্যুতের মত ওর মস্তিষ্কের মধ্যে একটা কথা খেলে যায়।

মহীতোষ রায়, সন্তোষ রায় এবং অমুতোষ রায় এর মধ্যে কোন একজন তো কুণাল রায় নয় ? কেন না, ওদের তিনজনের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি তো এখন একেবারেই নেই। ত্রিশ বছর আগে ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং কেউ কাউকে এখন আর চেনে না। কেবল এখন ওরা নামেই স্বপ্রকাশ।

তাহলে আজ রাত্রে কুণাল রায়ের পক্ষে মৃত্যুক্ষুধায় উন্মাদ হয়ে ওটা অস্বাভাবিক নয়।

বিষয়টা বিশ্লেষণ করতে তীক্ষ্ণ শীতলতার স্রোত বয়ে যায় দিলীপের শরীরের ভিতরে। চিন্তার অক্টোপাশে আবি মন নিয়ে খাট থেকে উঠে দাঁড়ায়। বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। সন্তর্পিত পদে নিশ্বাস বন্ধ করে দোতলায় নেমে যায়।

অন্ধকার বারান্দা, পথ।

একটা চাপা পদশব্দ শুনতে পেয়ে সিঁড়ির শেষধাপে থমকে দাঁড়ায় দিলীপ। নিজেকে আড়াল করে নেয়।

দোতলার মাঝের ঘরের দরজার কবাট দুটো খুলে কে যেন ঝাপসা ছায়ার মাঝে এসে দাঁড়ায়। পাথরের মত ভাব চিহ্নমাত্রহীন মুখ, দুটো চোখ আগুনের মত জ্বলছে।

চোখের দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে সেই ছায়ামূর্তি তাকায় চারিদিকে। তারপর শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দ পদসঞ্চারে এগিয়ে গিয়ে এক-তলায় নেমে যাওয়ার সিঁড়িপথটা ধরে নামতে থাকে।

অন্ধকারে ওকে আর দেখা যায় না।

দিলীপ অনুসরণ করে অত্যন্ত সন্তর্পিত পদে! ভাবে, কে এই লোক? অনুতোষ রায়ের ঘরে এত রাত্রে ও কি করতে গিয়েছিল? তবে কি কুণাল রায় ক্ষুধিত হিংস্র হয়ে উঠেছে এই নৈশ-নিস্তব্ধতায়?

নীচে নেমে আসে দিলীপ। দেখে, ছায়ামূর্তি কাছারিঘরের প্রবেশ-পথের দরজার ধারে দাঁড়িয়ে চারদিক লক্ষ্য করছে।

দিলীপের মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে যায়। পকেট থেকে বাঁ-হাত দিয়ে পেনসিল টর্চটা বের করে নিয়ে সামনের দিকে ফেলে বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বরে বলে— আপনি যেই হোন, পালাবার বৃথা চেষ্টা করবেন না।

ক্ষ্যাপা মোষের মত ঘুরে দাঁড়ায় ছায়ামূর্তি। ওর মুখের ওপর টর্চের কাঁপানো আলো পড়তে দিলীপের কণ্ঠস্বরের ভেতর দিয়ে একটি কঠিন ভর্ৎসনার সুর মূর্ত হয়ে ওঠে—অনুতোষবাবু, শেষে আপনিই তাহলে···

কথাটা ইচ্ছে করেই দিলীপ অসমাপ্ত রাখে।

www.boiRboi.blogspot.com

কাছারিঘরের প্রবেশের দরজার দু'পাশে বারান্দায় দেয়ালের গায়ে গুণচিহ্নের ভঙ্গিতে আড়াআড়িভাবে ঝুলছিল চারখানা তলোয়ার— দু'দিকেই মাথার ওপরে ছিল এক একখানা ঢাল। ঝকমক করে উঠছিল সেগুলো দিলীপের টর্চের আলোয়।

ঘটনার আকস্মিকতায় অনুতোষ রায় বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে পড়ে। মনস্থির করে নিতে ওর দেরি হয় না। হঠাৎ ডান হাত দিয়ে দেওয়ালের গায়ে ঝুলায়মান একখানা তলোয়ার টেনে নিয়ে রুক্ষগলায় বলে ওঠে —আপনি যা ভাবছেন, আসলে আমি তা নই। অনর্থক আমার পিছু নেবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে···

শক্ত মুঠোয় ধরা তলোয়ারখানা দেখায় অনুতোষ রায়। একটা ভয়ংকর ক্ষুধিত জিঘাংসায় ওর চোখের মণি দুটো যেন সাপের চোখের মত জ্বলজ্বল করে ওঠে।

দিলীপ নিঃশব্দে পকেটে হাত চালিয়ে পিস্তলটা বের করে বলে —তলোয়ারটা ফেলে দিয়ে এখন মাথার ওপর হাত দুটো তুলুন অনুতোষবাবু।

—আঁ্যা।—অনুতোষ রায়ের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত সরে যায়, সাদা হয়ে যায় কাগজের টুকরোর মত। ক্ষুব্ধ নিরাশ্বাসে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

দিলীপের গম্ভীর কণ্ঠস্বর আবার শোনা যায়—তলোয়ারটা হাতে রেখে মতলব ভাঁজবার চেষ্টা করবেন না, অনুতোষবাবু। ওটা ফেলে দিন। নয়ত...

একটা শব্দ হয়। অনুতোষ রায়ের হাত থেকে তলোয়ার ফেলে দেওয়ার শব্দ।

দিলীপ এগিয়ে গিয়ে ওর সম্মুখীন হয়। বলে—আপনিই তাহলে কুণাল রায় ?

— না-না, আমি কুণাল রায় নই। অনুতোষ রায়ের গলাটা একটা অজানা আতঙ্কে থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে—আমি কুণাল রায় হতে যাব কেন! আমি অনুতোষ রায়—কলকাতার চ্যাংয়ের আড্ডায় আমাকে কে না চেনে!

দাঁতে দাঁত চেপে দিলীপ বলে—তাই যদি হয়, তাহলে এতরাত্রে দোতলায় আপনার নিজের ঘর থেকে এখানে নেমে এসেছেন কেন ?

—পালাবার জন্যে। বিশ্বাস করুন, আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই। প্রতি মুহূর্তে একটা ভয়ে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। মনে হচ্ছে, কে যেন আমার প্রাণ নেবার জন্য ষড়যন্ত্র করছে অন্ধকারে।

—কাকাবাবু তো আপনাকে বলেছিলেন, কাল অবিনাশ বসাকের কাছে আপনার চলে যাওয়া সম্পর্কে সুপারিশ করবেন।

কেমন যেন ফ্যাকাশে হাসি হাসে অনুতোষ রায়—তা জানি, তবে মিস্টার নাগের সুপারিশে কোন ফল হবে না ভেবেই আমি এখান থেকে পালাবার মতলব করছিলাম। আমাকে এখন বাধা দেবেন না, মিস্টার সান্যাল—আমাকে যেতে দিন।

—আপনার এত ভয় পাওয়ার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছি না অনুতোষবাবু। আপনি না দু'বার ব্যাঙ্ক ডাকাতি করে জেল খেটেছেন!

—মানুষের সঙ্গে লড়বার মত শক্তি আমি আজও হারাইনি। কিন্তু

www.boiRboi.blogspot.com

নেকড়ে-মূর্তিধারী মানুষের সঙ্গে লড়বো কী শক্তি নিয়ে? অত শক্তি আমার কোথায়?

আচমকা মায়া-মঞ্জিলের নীরবতা ভেঙে টুকরো টুকরো করে অট্টহাসির আওয়াজ হল: হাঃ-হাঃ-হাঃ! হাসিটা রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা অদ্ভুত বিভীষিকায় খলখল করে উঠল।

বিস্ময়াহত অনুতোষ রায়ের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—ওই শুনুন!

আবার উন্মত্ত হাসির বন্যায় মুখরিত হয়ে গেল সমস্ত মায়া-মঞ্জিলটা।

এই আঁধার রাতের নিস্তব্ধতায় একটা আদিম পশুপ্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে—মায়া-মঞ্জিল কাঁপিয়ে ফেটে পড়েছে অট্টহাসিতে।

www.boiRboi.blogspot.com

নয়

নিস্পন্দ হয়ে থেমে গিয়েছিল দিলীপের মুখের মাংসপেশীগুলো। মাথার ভেতরে চিন্তার ঝড় বইছিল।

তেতলা থেকে ভয়ার্ত চিৎকার করে কে যেন বলে উঠল—দিলীপ—দিলীপ—

গলাটা দিলীপ চিনতে পারলো। চেঁচিয়ে বলল—আমি এখানে কাকাবাবু।

সোমপ্রকাশ নীচে নেমে এলেন। কম্পিতকণ্ঠে বললেন—এ কী ব্যাপার দিলীপ, একদণ্ডও যে আর এখানে থাকা চলে না।

ওঁর কথার সুরে সুর মিলিয়ে অনুতোষ রায় বলল—আপনি ঠিকই বলেছেন, মিস্টার নাগ! এখানে থাকলে অপঘাত-মৃত্যু আমাদের কপালে অবশ্যম্ভাবী।

—না। দিলীপ ধমক দিল।

ততক্ষণে সোমপ্রকাশ নিজেকে অনেকখানি শান্ত করে নিয়েছেন। কিন্তু দিলীপের কথায় বিষ মাখানো মনে হল ওঁর! বেশ একটু আহতকণ্ঠে বললেন—এ কথা তোমার মত ছেলের মুখে শোভা পায় না। অনুতোষ ঠিকই বলেছে!

হঠাৎ অনুতোষ রায় এগিয়ে গিয়ে সোমপ্রকাশের হাতদুটো গভীর আগ্রহে চেপে ধরল—অনুরোধের সুরে বলল—আমি এখান থেকে চলে যেতে চাই, মিস্টার নাগ। মিস্টার সান্যাল কেন যে

মিছামিছি আমাকে আটকে রাখতে চাইছেন, তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আপনি কি চান, আমি অপঘাতে মরি ?

—হ্যাঁ, তাতেই তোমার মৃত্যু লেখা আছে! কে যেন বলে উঠল পিছন থেকে।

ঘুরে দাঁড়াল সকলে। দিলীপ টর্চের আলো ফেলল।

কখন যে নিঃশব্দে সন্তোষ রায় ওদের পেছনে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, তা ওদের খেয়াল ছিল না।

দিলীপ বলল—সন্তোষবাবু, আপনি কি অট্টহাসি শুনে ভয় পেয়ে নীচে নেমে এসেছেন ?

প্রচ্ছন্ন বিরক্তিতে গম্ভীর গলায় সন্তোষ রায় বলল—যদিও ভূত-টুতে আমার বিশ্বাস নেই, কিন্তু এরকম ভূতুড়ে হাসিতে কি আর ঘুম হয়। আপনাদের গলার শব্দ শুনে নীচে নেমে এলাম।

একটা বাঁকা হাসি ঝকঝক করে উঠল দিলীপের মুখে। কিছু বলল না।

দোতলায় উঠে মহীতোষ রায়ের খোঁজ নেওয়ার জন্য ওর দরজায় ধাক্কা দিলেন সোমপ্রকাশ। দিলীপও পেছনে এসে দাঁড়াল। সোম-প্রকাশ উঁচুগলায় হাঁকলেন—মহীতোষ, দরজা খোলো।

কিন্তু ভেতর থেকে কোন সাড়া এল না। একটা চাপা গোঙানির আওয়াজ ভেসে এল ওর ঘর থেকে।

দিলীপের মস্তিষ্কের স্নায়ুর কোষে কোষে অগ্নিস্পর্শ লাগল যেন। দরজা ভেঙে ফেলার আদেশ দিল।

দরজার কবাট ভেঙে সকলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দেখল, বিছানায় শুয়ে রয়েছে মহীতোষ রায়। একটানা গোঙাচ্ছে।

মহীতোষ রায় জ্ঞান হারিয়েছেন।

বাকী রাতটা নিরুপদ্রবে কেটে গেল।

সকাল হতে সোমপ্রকাশ বৈঠকখানার দরজা খুলে দিতে ভৃত্যমহল থেকে মুরারীমোহন ও ভজহরি বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করল।

চায়ের টেবিলে বসে প্রাতরাশ সারতে সারতে মহীতোষ রায় বলল যে গত রাত্রে ঝোড়ো হাসির আওয়াজ শুনে ও ভীষণ ভয় পেয়েছিল, জ্ঞান হারিয়েছিল সেই কারণেই।

একথা শুনে একটা মতলব জেগে উঠল দিলীপের মনে। মুরারী-মোহনকে একটা ঘোড়া যোগাড় করতে বলল। একটু পরে মুরারী-মোহন একটা ঘোড়া যোগাড় করে আনল।

ঘোড়ায় চড়ে দিলীপ লাগামটা জোরে টানতেই ঘোড়াটা ছুটল উর্ধ্বশ্বাসে। ফাঁকা আকাশ। সূর্যের তেজ আগুনের ঢেউ তুলছে।

উত্তাল বাতাসে উড়ন্ত ধুলোর কুণ্ডলীর মাঝপথ দিয়ে দিলীপ পোস্ট-অফিসের পথে ঘোড়াটা ছুটায়।

পোস্ট-অফিস ও থানা কোন্‌পথে পড়বে, দিলীপ তা মুরারীমোহনের কাছ থেকে জেনে নিয়েছিল।

প্রথমে পোস্ট-অফিসে গিয়ে দিলীপ ত্রিদিবের কাছে টেলিগ্রাম করে। লেখে: সাত নম্বর তিলজলা লেনে আমার বন্ধু সুমথ নাগ থাকে। ওর কাছে গিয়ে জেনে নিবি যে, ওর বাবা সোমপ্রকাশ নাগ

মক্কেলের উইল-সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে স্বপনপুরের মায়া-মঞ্জিলে গেছেন কিনা। এই বিষয়টার উত্তর যত শিগগির পারিস, জানাবি।

তারপর দিলীপ থানায় যায়। অবিনাশ বসাকের সঙ্গে দেখা করে।

অবিনাশ বসাক অভ্যর্থনা করেন।

দিলীপ ওঁকে গতরাত্রের ঘটনাটা জানায়।

সব শুনে অবিনাশ বসাক যখন মুখখানা তোলেন, তখন আষাঢ়ের মেঘের মত অটুট গাম্ভীর্যে তা থমথম করছে। উনি বলেন—এ অবস্থায় অনুতোষবাবুকে এখান থেকে কিছুতেই চলে যাওয়ার আদেশ দিতে পারি না। ভদ্রলোকের ওপর আমার বেশ সন্দেহ হয়েছে।

দিলীপ আবার ঘোড়া ছুটায়।

চৈত্রের শেষ। তামার মত আকাশের রঙ, প্রখর সূর্যতাপে নিস্পন্দ নিষ্প্রাণ প্রকৃতি ঝলসে যাচ্ছে। কোথাও এতটুকু জলের প্রত্যাশা নেই।

মায়া-মঞ্জিলে যখন দিলীপ পৌঁছোয়, তখন ওর সর্বাঙ্গ ঝিমঝিম করছে—গলা শুকিয়ে গেছে।

তারপর একসময়ে সূর্য ডুবে গেল। আলোর উদ্বৃত্তটুকু নিঃশেষ হয়ে গেল সন্ধ্যার নিস্তব্ধ দিগন্তে। মুক্ত নীল আকাশে দেখা দিল সন্ধ্যাতারার ঝিকিমিকি।

মহীতোষ রায়ের ঘরের দরজাটা মেরামত করে দিয়ে ছুতোর মিস্ত্রী চলে গেল।

রাত্রির খাওয়াদাওয়া ন'টার মধ্যেই শেষ হয়ে গেল।

দিলীপের কাছে অবিনাশ বসাকের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অনুতোষ রায় উপরে চলে গেল।

মহীতোষ রায়ের শরীর খারাপ হয়েছিল বলে রাত্রের আহার না করেই ও নিজের ঘরের দরজায় খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

মুরারীমোহন ও ভজহরি ভৃত্যমহলে যাবার জন্য কাছারিঘরের দরজা-পথ দিয়ে বেরিয়ে গেলে, সোমপ্রকাশ কাছারিঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। বৈঠকখানায় এসে দেখলেন, রক্তশোষক বাদুড় সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে সন্তোষ রায় আগের রাত্রের মতই দিলীপের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছে।

একটু পরে সন্তোষ রায় হাই তুলতে তুলতে উঠে দাঁড়াল। তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে আস্তে আস্তে ঘর থেকে প্রস্থান করল।

ওর পদশব্দ মিলিয়ে যেতে সোমপ্রকাশ ফিসফিস করে দিলীপকে বললেন— কিছু পেলে দিলীপ।

—কী?—সোমপ্রকাশের মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করল দিলীপ।

মেঘাচ্ছন্ন সন্দিগ্ধ গলায় সোমপ্রকাশ বললেন—বুঝতে পারছ না আমি কি বলতে চাইছি? পরিতোষের হত্যাকারী কে? কে নিষ্ঠুরভাবে খুন করেছে পরিতোষকে?

—আপনার কাকে মনে হয়?

সোমপ্রকাশ সমস্ত মুখে স্বচ্ছ একটা সরলতার ভান করে বললেন —কাকে আবার মনে হবে? সন্তোষই পরিতোষকে খুন করেছে।

শুকনো গলায় দিলীপ বলল—সন্তোষবাবুকে সন্দেহ করার মত কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

—তা অবশ্যি তেমন পাইনি! কিন্তু ওর ওই অবাস্তব গল্পকে সত্যি বলে জাহির করার কারণ কী?

—হয়ত উনি বিশ্বাস করেন। দিলীপ বলল—তবে কারো বিরুদ্ধে সন্দেহ করবার মত কোন প্রমাণ আমি এখনো পাইনি। সন্তোষবাবুর কথাই হয়ত ঠিক। কোন রক্তশোষক বাদুড় কিংবা কোন নেকড়ে-মূর্তিধারী মানুষেরই এসব কীর্তি।

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন সোমপ্রকাশ, চাপা বিদ্রূপ ছড়িয়ে দিলেন জবাবে।

www.boiRboi.blogspot.com

দশ

ঝড় উঠল একসময়ে।

বিদ্যুতের তীব্র ঝলকের সঙ্গে কানে তালা লাগিয়ে কোথায় যেন বাজ পড়ল।

প্রথমে অভ্রের গুঁড়োর মত একটু একটু বৃষ্টি ঝরল। তারপরেই মুষলধারে বৃষ্টি নেমে এল।

দিলীপ জানলার শার্সি খুলে দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল জানলার ধারে। প্রকৃতির উন্মত্ততা দেখছিল চোখ ভরে।

একটু আগেই ও নিজের ঘরে চলে এসেছিল, গতরাত্রের মত সোমপ্রকাশকে সাবধান-বাণী শুনিয়ে।

চোখ দুটো অসহ্য ঘুমে জ্বালা করছিল দিলীপের। তাই জেগে থাকবার জন্যে জানলার ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল।

চারিদিকে ধোঁয়াকার করে বৃষ্টি নেমেছে মুষলধারে। উদ্দাম বাতাস হা-হা করে ছুটে যায়। ভেকের অবিরাম মিশ্র রাগিণী জেগে ওঠে স্তব্ধতার বুক চিরে।

কড়-কড়-কড়াত। বাজের তীক্ষ্ণ নীল আলোয় চোখের পলকের জন্য চারিদিক আলোকিত হয়ে ওঠে।

দিলীপ একটা সিগারেট ধরায়। ওর জাগ্রত কর্ণে একটা আওয়াজ ধরা পড়ে। কে যেন সোমপ্রকাশের ঘরের দরজায় মৃদু টোকা দিচ্ছে।

দেওয়ালের ঝাড় বাতিটা জ্বালিয়ে রেখেই সোমপ্রকাশ সবেমাত্র

বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, দরজার ওপরে মৃদু টোকার শব্দ শুনে শুয়ে শুয়েই প্রশ্ন করলেন—কে তুমি?

নীচুগলার আওয়াজ ভেসে এল—আমি সন্তোষ। দরজাটা খুলুন মিস্টার নাগ, আপনার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ দরকার আছে।

বিরসমুখে খাট থেকে নেমে গিয়ে সোমপ্রকাশ দরজাটা খুলে দিলেন। সন্তোষ রায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দরজায় খিল লাগিয়ে দিল।

—খিল লাগালে কেন? ভীতকণ্ঠে সোমপ্রকাশ বলে উঠলেন।

—বললাম তো, আপনার সঙ্গে আমার একটু বিশেষ দরকার আছে।

সোমপ্রকাশের কান দুটো গরম হল রক্তের স্পন্দনে; উত্তেজিত উৎকণ্ঠ আবেগে বললেন—আমার ভীষণ ঘুম পেয়েছে। যা বলবে, চটপট বলো। দরকারটা কিসের শুনি?

হাসল সন্তোষ রায়। অপরিমিত—বিযাক্ত অপরিমিত হাসি।

ক্রোধে ও উত্তেজনায় সোমপ্রকাশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, বললেন, —অনর্থক দেরি করছ কেন, বলো!

আস্তে! —ধমক দিল সন্তোষ রায়। দেহটা সাপের মত দুলল! দু'চোখ জ্বলল।

ভয় যেন থাবা পেতে বসল সোমপ্রকাশের মনের মধ্যে। যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। অসহায় কণ্ঠে বললেন—আমাকে খুন করবার মতলবে এসেছ নাকি?

—একরকম তাই।—সন্তোষ রায় ডান হাতখানা প্রসারিত করে বলল—আয়রন-সেফের চাবিটা দিন তো।

সোমপ্রকাশ আঁতকে উঠলেন—আয়রন-সেফের চাবি নিয়ে তুমি কি করবে?

—বাবার উইলটা নষ্ট করে ফেলব।

—কিন্তু কেন?

—মুখ চোখ ক্রুর বিদ্রূপে বিকৃত হয়ে এল সন্তোষ রায়ের—সেটা জানেন না বুঝি? এখন বাজে কথা না বলে চাবিটা ভদ্রভাবে আমার হাতে তুলে দেবেন কিনা বলুন।

—না। সোমপ্রকাশ নিজেকে ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন।

—কিন্তু না দিলে আপনাকে বিপদে পড়তে হবে।

তীব্র কটাক্ষপাত করে সোমপ্রকাশ ঠোঁট বাঁকালেন—বিশ্বাস-ঘাতকতা করা আমার পেশা নয়। উইলটা নষ্ট করে তোমরা তিন ভাই ভুজঙ্গনারায়ণের বাইশ হাজার টাকা আর এই বাড়িটার মালিক হবে, এ আমি কিছুতেই হতে দেবো না।

সন্তোষ রায়ের চোখে বিদ্রূপের স্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠল; কঠোর স্বরে বলল—কুণাল যে বেঁচে নেই, এ আমি হলফ করে বলতে পারি। নয়ত আমরা সবাই এলাম, সে এলো না কেন?

—তার জন্যে আমি অপেক্ষা করব। তার ফিরে আসার জন্য কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দেবো। তোমরা যদি বেঁচে থাকতে পারো, নিশ্চয় তাহলে সে বেঁচে আছে। সে যদি তার বাবার উইলটা প্রত্যাখ্যান করে তখন তোমাদের কথা ভাবা যাবে।

—কিন্তু ততক্ষণ আমি ধৈর্য ধরতে রাজী নই। তাছাড়া টাকার আমার বিশেষ দরকার।

—আগে যা করে উপায় করছিলে, তাই করে টাকার বন্দোবস্ত করোগে।

—তাতে পুলিসের উপদ্রব আছে বলেই আমি এই সহজ পন্থাটা হারাতে চাই না। আয়রন-সেফের চাবিটা এখন দেবেন কিনা বলুন।

ধমকের সুরে সোমপ্রকাশ বললেন—আমাকে অযথা অনুরোধ করছ সন্তোষ, প্রাণ থাকতে তুমি আমার কাছ থেকে আয়রন-সেফের চাবি পাবে না।

নিষ্ঠুর একটা পৈশাচিক হাসি খেলে গেল সন্তোষ রায়ের ঠোঁটে। তীক্ষ্ণ চোখে বলল—তাহলে একান্তই মরতে চান?

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার দিকে এক পা এগোবার চেষ্টা করলে চিৎকার করে দিলীপকে ডাকবো। ভালোয় ভালোয় এখন ঘর থেকে চলে যাও।

কেমন যেন দমে গেল সন্তোষ রায়। কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভাবল। তারপর বলল—বেশ তাই যাচ্ছি। তবে যে করেই হোক, উইলটা আমি নষ্ট করবই।

একটু এগিয়ে গিয়ে সন্তোষ রায় দরজার খিলটা খুলবার জন্য খিলে হাত দিলে। কিন্তু পর মুহূর্তেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে অতর্কিতে সোমপ্রকাশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। শক্ত দুটো হাতে চেপে ধরল ওঁর কণ্ঠনালীটা।

কেমন একটা গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসতে লাগল সোমপ্রকাশের গলা দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত পরে উনি জ্ঞান হারিয়ে মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লেন।

www.boiRboi.blogspot.com

এগারো

চাবির রিংটা সোমপ্রকাশের পকেট থেকে নিয়ে সন্তোষ রায় দরজার খিলটা খুলল। বেরিয়ে কয়েক পা এগিয়েছে, হঠাৎ সামনে থেকে দিলীপের বজ্রগম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল—নীচে গিয়ে আয়রন-সেফ থেকে আপনার বাবার উইলটা বের করে নষ্ট করবার চেষ্টা করবেন না। আপনার সব কথাই আমি এখান থেকে শুনতে পেয়েছি।

থমকে দাঁড়াল সন্তোষ রায়। ঠোঁটের কোণদুটো একটু বিস্তৃত করে তীক্ষ্ণ সর্পিল হাসি হাসল।

দিলীপ বলল—চাবির রিংটা আমাকে দিন।

চোখ দুটোকে হঠাৎ তীক্ষ্ণ সংকুচিত করে এনে সন্তোষ রায় কোমরের গোপন গ্রন্থির কোণ থেকে অজগরের জিভের মত একখানা ছোরা বের করল। একটা হিংস্র প্রতিজ্ঞায় বারো ইঞ্চি পরিমাণ ছোরাটা মুঠোতে উদ্যত হয়ে উঠল। বজ্রগর্ভ কঠিন আদেশের গলায় বলল, আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না, মিস্টার সান্যাল, বাধা দিলে কিন্তু তার ফল ভালো হবে না।

একটা দুরন্ত ক্রোধে দিলীপের মুখের মধ্যে চাপা দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল, চোখের তীব্র চাহনি হেনে বলল—দিলীপ সান্যাল আপনার মত অনেক ক্রিমিন্যালকেই শায়েস্তা করেছে। এখনো বলছি, চাবির রিংটা আমাকে দিন।

ঠোঁটে ধারালো হাসি বিছিয়ে দিয়ে সন্তোষ রায় বলল—তীরে এসে তরী ডোবার মত বোকা আমি নই। এ ব্যাপারে আপনার মাতব্বরি না করলেও চলবে। ভালোয় ভালোয় এখন আমার পথ ছেড়ে দিন।

—আগে চাবির রিংটা আমাকে দিন।

সন্তোষ রায়ের মুখে রেখায়িত হয়ে উঠল খানিকটা অমানুষিক লোলুপতা, হিংস্র শ্বাপদের মত চোখ দুটো জ্বলে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, তাহলে মরুন।

ছোরাটা লক্ষ্য স্থির করে ছুঁড়বার আগেই দিলীপ পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে ট্রিগার টিপল। ছোরাটা সন্তোষ রায়ের হাত থেকে ঠিকরে গিয়ে পড়ল এবং অপর হাতে আহত হাতখানা চেপে ধরে আর্তনাদ করে মেঝের ওপর বসে পড়ল।

দিলীপ পাথরের মত শক্ত গলায় বলল—আঘাতটা ইচ্ছা করেই সামান্য করলাম। এবার নিশ্চয় চাবির রিংটা আমাকে দিতে আপত্তি করবেন না।

ঘষা কাঁচের মত ফ্যাকাশে সন্তোষ রায়ের চোখের তারাদুটো নেকড়ের চোখের মত রক্তক্ষুধায় জ্বলজ্বল করে উঠল।

কয়েক মিনিট পরে দিলীপ সন্তোষ রায়ের কাছ থেকে চাবির রিংটা নিয়ে ওকে বলে—আপাতত নিজের ঘরে গিয়ে খিল লাগিয়ে শুয়ে পড়ুন গে; কোনরকমে গোলমাল বাধাবার চেষ্টা করবেন না।

আহত বাঘের মত কটমট দৃষ্টিতে তাকিয়ে সন্তোষ রায় নীচে নেমে

যায়। ওর ঘরের দরজায় খিল লাগানোর শব্দ হলে দিলীপ সোমপ্রকাশের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

মেঝেয় পড়ে রয়েছেন সোমপ্রকাশ। নীরব নিস্পন্দ।

ঘরের এককোণে রাখা কুঁজো থেকে গেলাসে করে জল ভরে এনে দিলীপ সোমপ্রকাশের চোখেমুখে জলের ঝাপটা দেয়।

সোমপ্রকাশের জ্ঞান ফিরে আসে একসময়ে। উনি ক্লান্ত শিথিল শরীরে কোনরকমে উঠে দাঁড়ান।

হঠাৎ একটা যন্ত্রণা-কাতর তীব্র আর্তনাদ ঝড়-বৃষ্টির উদ্দামতা ভেদ করে জেগে ওঠে। আর্তনাদটা প্রাণভয়ে ভীত ব্যক্তির।

একটা ঝাঁকুনি খায় দিলীপ, ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

তরল জলস্রোতের মত সিঁড়িগুলোর ধাপ পেরিয়ে দোতলায় নেমে আসে। আর্তনাদটা যে মহীতোষ রায়ের ঘর থেকে হয়েছিল, তা ও বুঝতে পেরেছিল।

দরজার সামনে থেমে গিয়ে দিলীপ দরজায় ধাক্কা মেরে জোর গলায় ডাকে—মহীতোষবাবু!…

ততক্ষণ সন্তোষ রায়, অনুতোষ রায় এবং সোমপ্রকাশ দিলীপের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সকলের মুখগুলো কাগজের টুকরোর মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

বন্ধ দরজায় ধাক্কা মেরে ভেতর থেকে কোন সাড়া না পাওয়া গেলে কবাট ভেঙে ফেলা হয়।

সকলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

রহস্যময় কুটিল অন্ধকার মাখানো ঘর।

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে বাতি জ্বালানো হয়।

এগিয়ে যায় সকলে খাটের দিকে।

পথের মাঝে সাপ দেখলে মানুষ যেমন ত্রস্ত হয়ে ওঠে, সকলে তেমনি অভিভূতের মত থমকে দাঁড়ায়।

খাটের ওপরে মহীতোষ রায়ের পেশীবহুল বলশালী শরীর অনড় অটল হয়ে পড়ে রয়েছে। আলোর মলিন আভা মুখের ওপর প্রতিফলিত হয়ে ওর মুখখানাকে বীভংস ভয়ংকর করে তুলেছে। গোল গোল চোখের মণিদুটো যেন চক্ষুকোটর থেকে ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। জিভটা খানিকটা বেরিয়ে এসেছে মুখবিবর থেকে।

সমগ্র মুখখানায় ফুটে উঠেছে একটা নিদারুণ বিভীষিকা!

মহীতোষ রায়ের গলার নলীটা কে যেন ধারালো নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে আকণ্ঠ রক্তপান করেছে।

www.boiboi.blogspot.com

বারো

ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ অনড় হয়ে গেছে সকলে। দিলীপ জানলার ধারে এগিয়ে যায়।

হঠাৎ জানলার শার্সির দিকে তাকাতেই দিলীপের আচ্ছন্ন শরীর যেন ঝংকার দিয়ে ওঠে।

শার্সির কাঁচ ভাঙ্গা। মেঝের ওপর ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো পড়ে রয়েছে অসংখ্য পরিমাণে।

সেই ভাঙ্গা শার্সি-পথের ভেতর দিয়ে বাইরে দৃষ্টিটা সঞ্চালিত করে দিলীপ।

ঠিক সেই সময়ে বজ্রপাত হয় কোথায় যেন। তলোয়ারের মত ধারালো বজ্রের তীক্ষ্ণ নীল আলো খেলে যায়। দিলীপ দেখতে পায়, গাঢ় কালিমায় রেখায়িত এক মূর্তি লম্বা লম্বা পা ফেলে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে পতিতপাবনীর মন্দিরের দিকে।

দিলীপের বুকের ভেতরটা অসহিষ্ণু আবেগে কেঁপে ওঠে হঠাৎ। ছুটে ঘর থেকে সে বেরিয়ে যায়।

ঘরের ভিতর থেকে একটা উন্মাদনায় বিভ্রান্ত হয়ে সোমপ্রকাশ ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন—বাড়ির বাইরে বেরিয়ো না দিলীপ—রক্তশোষক বাদুড়টা হয়ত কারো প্রাণ নেবার জন্য ওত পেতে বসে আছে।

সে কথায় দিলীপ কান দেয় না। নীচে নেমে এসে কাছারি-ঘরের দরজা খুলে বারান্দার সিঁড়ির ধাপগুলো পেরোয় দ্রুতপদে।

তারপর মন্দিরের দিকে ছুটে চলে। যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় ওর আসন্ন কিছু একটার সংকেত পেয়েছে।

মায়া-মঞ্জিলের ফটক থেকে প্রায় পাঁচশো গজ দূরে পতিতপাবনীর মন্দির। মন্দিরের অষ্ট ধাতুর গৃহদেবী এখন চৌধুরীরা সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দিলীপ মায়া-মঞ্জিলের দেউড়ি পেরিয়ে যায়।

বৃষ্টিটা তখন থেমে গিয়েছিল। কিন্তু বৃষ্টি-ধারাস্নাত গাছের পাতা থেকে জলবিন্দুগুলি টুপ-টাপ করে ঝরে পড়ছিল।

হঠাৎ কালো আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ-শিখা লকলকিয়ে ওঠে।

সেই সামান্য আলোয় দেখা যায়, কালো মূর্তিটা ততক্ষণ মন্দিরের সম্মুখীন হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক বিকৃত ক্ষিপ্রতায় অন্ধকার জড়িয়ে এগিয়ে চলেছে।

চোরের মত চুপি চুপি দিলীপ ওকে অনুসরণ করে।

একসময়ে মন্দিরের কাছে গিয়ে হাজির হয়।

জীর্ণ ভগ্নপ্রায় মন্দির। মর্মান্তিক নীরবতার মাঝে অন্ধকারে প্রেতের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে।

চারিদিকে ঝোপ-ঝাড় আর আগাছায় ভরা।

দিলীপ পা টিপে টিপে সিঁড়ির ধাপগুলো পেরিয়ে মন্দিরের দ্বার-প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়। মুখটা সামান্য বাড়িয়ে ভেতরের দিকে তাকায়।

মন্দিরের ভেতরে কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। মাইক্রোফোনের সামনে মুখ নিয়ে গিয়ে কালো মূর্তিটা অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছে।

সেই প্রচণ্ড তীক্ষ্ণ হাসিতে সমস্ত মন্দিরটা কেঁপে ওঠে, তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে যায় দেওয়াল থেকে দেওয়ালে।

দিলীপ বুঝতে পারল সমস্ত বিষয়টা। এই মন্দিরের ভেতর মাইক্রোফোন আর ব্যাটারির সাহায্যে আততায়ী উন্মত্ত হাসিতে ভেঙে পড়ে। মায়া-মঞ্জিলের কোথাও লাউডস্পীকার লাগানো আছে। উন্মত্ত হাসি গিয়ে মায়া-মঞ্জিলে পৌঁছিয়ে একটা বিভীষিকার সৃষ্টি করে।

কিন্তু আততায়ী কি নেকড়ে-মূর্তিধারী মানুষ কিংবা রক্তশোষক বাদুড়ে বিশ্বাস করে?

হাসি থেমে গেল কয়েক মুহূর্ত পরে। শ্মশানের মত থমথম করতে লাগল।

মনস্থির করে নিয়ে দিলীপ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করল। হাতে উদ্যত পিস্তল।

ওর পায়ের শব্দে মূর্তিটা উঠে দাঁড়ালো বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত।

আশ্চর্য! মূর্তিটার মুখখানা অবিকল নেকড়ের মুখের মত। সর্বাঙ্গে কালো রঙ চকচক করছে। পাঁচ ফুটের মত লম্বা শরীর।

মূর্তিটা এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে। ক্ষুদে ক্ষুদে চোখে জ্বলন্ত অগ্নির নিষ্ঠুরতা মাখানো। হঠাৎ একখানা ডানার ঝাপটা লাগতে দিলীপ হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

ডানাটা যেন ইস্পাতের মত শক্ত।

দিলীপ মূর্তিটার ডানা লক্ষ্য করে পিস্তলের ট্রিগার টিপল।

রাত্রির জমাট স্তব্ধতা ফালি ফালি করে শব্দ জেগে উঠল: গুড়ুম!

আশ্চর্য! মূর্তিটার শরীরে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগেনি।

দিলীপের আগ্নেয়াস্ত্র আবার পরপর দুবার অগ্ন্যুদ্গীরণ করল।

কিন্তু কোন ফল হল না!

হোহো করে হঠাৎ মূর্তিটা বাজের মত তীক্ষ্ণ হাসি হেসে উঠল। সেই ভয়ংকর হাসির শব্দ মন্দিরের দেওয়ালে দেওয়ালে যেন একটা ভৌতিক বিভীষিকায় প্রেতায়িত হয়ে উঠল।

মূর্তিটা হঠাৎ দিলীপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা বিশ্রী আওয়াজ উঠল ঃ ধপ্ !

মুহূর্তে দিলীপ সেখান থেকে সরে গেল। উঠে দাঁড়ালো মেঝে থেকে। পিস্তলটা মেঝেতেই পড়ে রইল।

মূর্তিটাও উঠল। কালো কালো দু'খানা ডানা দু'দিকে প্রসারিত করে দিলীপের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

দিলীপ এক পা এক পা করে পেছোতে লাগল। দেখল, পেছনের একদিকে একটা প্রকাণ্ড পাথরের টুকরো পড়ে রয়েছে।

খ্যাপা জানোয়ারের মত গর্জন করতে করতে এগিয়ে এসে মূর্তিটা দিলীপের ওপর আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। সাঁড়াশির মত শক্ত দু'খানা লৌহ ডানার বেষ্টনী চেপে ধরল দিলীপের গলাটা।

যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলো দিলীপের। যুযুৎসুর এক প্যাঁচ কষিয়ে ও আপ্রাণশক্তিতে এক প্রচণ্ড ধাক্কা মারলো।

মূর্তিটা দূরে ছিটকে গিয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়াল আস্তে আস্তে।

দিলীপ নিশ্বাস বন্ধ করে ভারি প্রস্তরখণ্ডটা তুলে নিলো, প্রাণপণ বলে ছুঁড়লো মূর্তিটার মাথা লক্ষ্য করে।

একটা চাপা গর্জন শোনা গেল। মূর্তিটা মাটিতে পড়ে গেল।

দিলীপের মাথায় তখন ফার্নেস জ্বলছে। ছুটে গিয়ে প্রস্তরখণ্ডটা তুলে নিয়ে আবার মূর্তিটার মাথা লক্ষ্য করে ছুঁড়ল।

তীক্ষ্ণ তীব্র একটা আর্তনাদ বাতাসকে ভারী করে জেগে উঠল।

পিস্তলটা মেঝে থেকে বিদ্যুৎবেগে তুলে নেয় দিলীপ, দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ ঘৃণা জ্বেলে বলে—কোনরকম নড়বার চেষ্টা করবে না। এবার আমি বুঝতে পেরেছি কোথায় গুলি করলে আঘাত লাগবে। হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমার চোখ লক্ষ্য করেই গুলি ছুঁড়ব।

কিন্তু মূর্তিটার মুখের ভেতর দিয়ে অদ্ভুত বিকৃত বীভৎস গোঙানির শব্দ বেরোয়।

ততক্ষণে ভজহরিকে নিয়ে সোমপ্রকাশ সেখানে হাজির হয়েছেন। দ্বারপ্রান্তে থমকে দাঁড়িয়েছেন।

—কী ভয়ানক!

সোমপ্রকাশের গলার স্বর শুনে দিলীপ পেছন ফিরে তির্যক দৃষ্টিতে তাকায়, ক্লান্ত পরিশ্রান্ত গলায় বলে—ভেতরে আসুন কাকাবাবু, এখন আর কোন ভয় নেই।

ভীত-ত্রস্ত মুখে মূর্তিটার দিকে তাকাতে তাকাতে সোমপ্রকাশ বলেন—কিন্তু এটা সত্যিই কি কোন নেকড়ে-মূর্তিধারী মানুষ? তাছাড়া রক্তশোষক বাদুড়ও তো কখনো এরকম হয় না।

ওঁর কথাটা কানে নেয় না দিলীপ, মূর্তিটার মুখের কাছে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে মূর্তিটার মুখের চারপাশে তাকাতে তাকাতে, মূর্তিটার ঘাড়ের কাছে ছোট একটা আংটা ধরনের জিনিষ দেখতে পায়। সেটা ধরে টানে। তারপর মূর্তিটার দেহের ওপরের আচ্ছাদনটা খুলে ফেলে।

মূর্তিটা একটা মানুষের! সুস্থ সবল চেহারা। এবং সেই মানুষটি পায়ের পাতা থেকে মাথা পর্যন্ত ইস্পাতের মোড়কবন্দী দিয়ে নিজেকে আচ্ছাদিত করেছিল। বুলেট-প্রুফ মোড়কবন্দী! সেই

কারণেই দিলীপ আগ্নেয়াস্ত্র থেকে অগ্ন্যুদ্গীরণ করে ওর শারীরিক ক্ষতি করতে পারেনি। মুখে ছিল ইস্পাতের মুখোশ। মুখোশটা অবিকল নেকড়ের মুখের মত।

প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে ওর মাথাটা থেঁতলে গিয়েছিল। জমাট রক্ত সারা মুখখানাকে বীভৎস করে তুলেছিল। আসন্ন মৃত্যুর সুবিপুল অন্ধকারের ছায়া ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। প্রতি নিশ্বাসে ওর সারা দেহ কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

সোমপ্রকাশের মাথায় যেন সমস্ত রক্ত এসে জমাট বাঁধে। ওঁর বিস্ফারিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়—এ যে মুরারীমোহন দেখছি!

দিলীপ ভ্রূ কুঁচকে সোমপ্রকাশের দিকে তাকায়। কোন উত্তর দেয় না। মনুষ্য-মূর্তিটার প্রায় মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে শান্ত মোলায়েম গলায় বলে, মুরারীমোহনকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? বলুন, চুপ করে থাকবেন না—বলতে চেষ্টা করুন।

পেছন থেকে সোমপ্রকাশের সপ্রশ্ন ভুরুর রেখায় বিস্ময় জেগে ওঠে—তাহলে সত্যিই এ মুরারীমোহন নয়? কিন্তু অবিকল মুরারীমোহনের মতই তো এর চেহারা।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে দিলীপ বলে, চুপ করে থাকুন কাকাবাবু। পরে সব কিছু জানতে পারবেন। মনুষ্য-মূর্তিটাকে আবার অনুরোধ করে দিলীপ—মুরারীমোহন কোথায়? ওকেও কি তুমি হত্যা করেছ?

—না। মনুষ্য-মূর্তিটা হাঁফাতে হাঁফাতে অর্ধস্ফুটকণ্ঠে বলে, মুরারীমোহনকে আমি হত্যা করিনি। আজ সকাল সাড়ে এগারোটার

ট্রেনে কলকাতা থেকে ওর এখানে আসার কথা আছে। এই মন্দিরেই আমার সঙ্গে ও দেখা করতে আসবে।

মনুষ্য-মূর্তি আরো কী যেন বলতে গেল, পারল না—ঠোঁট দুটো কেঁপে কেঁপে নীরব হলো। অন্তরের কথা ওষ্ঠের প্রাচীর ভেঙে আত্মপ্রকাশ করল না।

নির্বাক বুদ্ধিভ্রষ্টের মত ভজহরি ও সোমপ্রকাশ দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে।

কয়েক মিনিট পরে সেই হতভাগ্যের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল।

দিলীপ সোমপ্রকাশকে মৃদুকণ্ঠে ডাকল—কাকাবাবু, এধারে আসুন।

সংকুচিতপদে সোমপ্রকাশ এগিয়ে গিয়ে দিলীপের পেছনে দাঁড়ালেন।

দিলীপ সেই হতভাগ্য মৃতের শিথিল হাতের তালুটা সোমপ্রকাশকে দেখিয়ে বলল—দেখুন তো একে চিনতে পারেন কিনা!

মুখখানা ধোয়া চাদরের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেল সোমপ্রকাশের। ভাঙ্গা অবসন্ন গলায় বললেন—হাতের তালুতে কালো কালো চুল তো কুণালেরই ছিল।

দিলীপ বলল, আপনি ঠিকই ধরেছেন কাকাবাবু। হতভাগ্য কুণাল রায়ই পরিতোষবাবু আর মহীতোষবাবুকে হত্যা করেছেন। উনিই মায়া-মঞ্জিলে মুরারীমোহনের ভূমিকা নিয়েছিলেন।

কুণ্ঠিত-বিস্ময়ে একটা ঢোক গিললেন সোমপ্রকাশ।

তেরো

রাতের আকাশ একটু একটু করে ফিকে হয়ে উঠল। আবছা অন্ধকার পরিষ্কার হয়ে গেল একসময়ে।

সূর্য উঠল। রঙিন সূর্য।

একটু পরে মায়া-মঞ্জিলে পোস্ট-অফিসের পিওন এলো সাইকেল হাঁকিয়ে। জানালো, দিলীপ সান্ন্যালের নামে 'তার' এসেছে।

'তার' করেছে দিলীপের সহকারী ত্রিদিব চৌধুরী। লিখেছে 'সুমথ নাগের বাবা হচ্ছেন সোমপ্রকাশ নাগ। উনি ভুজঙ্গনারায়ণ রায় নামে এক মক্কেলের উইল সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে স্বপনপুরের মায়া-মঞ্জিলে গেছেন।'

'তার'টা পড়ে দিলীপের মন থেকে সন্দেহের কুয়াশাটা কেটে গেল।

সাড়ে বারোটায় পতিতপাবনীর মন্দিরে আসল মুরারীমোহনকে আবিষ্কার করা হলো।

শীর্ণ চেহারা। মুখে বয়সের ভাঁজ পড়েছে। হাত দুটোয় কর্কশতা।

দিলীপের প্রশ্নে মুরারীমোহন ভীতকণ্ঠে জানালো : ভুজঙ্গনারায়ণের দ্বিতীয় উইলের বিষয়ের খানিকটা ও জানত। মৃত্যুর আগে ভুজঙ্গ-নারায়ণ ওকে জানিয়েছিলেন। ওঁর মৃত্যুর পর পাঁচ ছেলেকে এখানে জমায়েত করবার ভার উনি সোমপ্রকাশকে দিয়ে গেছেন। পাঁচ ছেলে এখানে এলে অ্যাটর্নি সোমপ্রকাশ নাগ ওদের সামনে ভুজঙ্গনারায়ণের উইল পড়বেন।

কুণাল রায় ভুজঙ্গনারায়ণ রায়কে আন্তরিক শ্রদ্ধা করত। তাই যেদিন গোপনে ও ওর বাবাকে দেখবার জন্যে মায়া-মঞ্জিলে এলো, সেদিন ওর আসবার কয়েক ঘণ্টা আগে ভুজঙ্গনারায়ণের মৃত্যু হয়েছিল। শোকে সেদিন ছেটে ছেলের মত ডুকরে ডুকরে কেঁদেছিল কুণাল রায়।

তারপর ভুজঙ্গনারায়ণের শেষকৃত্য সম্পাদিত হয়ে গেলে মুরারীমোহন কুণাল রায়কে মায়া-মঞ্জিলে থেকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। সেই সঙ্গে মৃত্যুর আগে বলে যাওয়া ভুজঙ্গনারায়ণের সেই কথাটাও জানালো।

সব শুনে কুণাল রায় মুরারীমোহনকে কলকাতার এক অন্ধ গলির মধ্যে বস্তির একটা কুঁড়ে ঘরে দিনকয়েক কাটিয়ে দিতে বলল। সেই কুঁড়ে ঘরেই কুণাল রায়ের তখনকার বাসস্থান ছিল।

মুরারীমোহন প্রথমে মৃদু আপত্তি করল। কিন্তু শেষে কুণাল রায়ের পীড়াপীড়িতে ওকে কলকাতায় যেতে হলো। যাওয়ার আগে কুণাল রায় ওর হাতে দশ টাকার তিনখানা নোট দিলো এবং বলল, দু'সপ্তাহ পরে এখানকার পতিতপাবনীর মন্দিরে ওর সঙ্গে যেন মুরারীমোহন দেখা করে।

কুণাল রায়ের কথামত মুরারীমোহন আজ কুণাল রায়ের সঙ্গে পতিতপাবনীর মন্দিরে দেখা করতে এসেছে।

মুরারীমোহন বক্তব্য শেষ করে চুপ করল।

ও যে নিজের বক্তব্যে মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়নি, তা ওর মুখ-চোখ ও কথা বলার ধরন দেখেই দিলীপ বুঝতে পারল।

চৌদ্দ

সেদিন বিকেলে মায়া-মঞ্জিলের বৈঠকখানায় সমস্ত বিষয়টা পরিষ্কার করার জন্য দিলীপ অবিনাশ বসাককে আহ্বান করেছিল।

অবিনাশ বসাক ছাড়া মায়া-মঞ্জিলের অন্যান্য প্রাণীরাও সেখানে জমায়েত হয়েছিলেন।

দিলীপ বলছিল, গত পরশু রাত্রে রক্ত-শোষক বাদুড় এবং নেকড়ে মূর্তিধারী মানুষের প্রসঙ্গে আমি কাকাবাবুকে বলেছিলাম, মহীতোষ-বাবুর কথাগুলোর একটা দিক্ আমি বিশ্বাস করি। তবে সমস্ত প্রসঙ্গটাই আজকের বিজ্ঞানের যুগে অচল। কিন্তু এমন লোকও এ জগতে বর্তমান, যারা কিনা এই অন্ধ গোঁড়ামির সুযোগে নিজেদের আসল উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে নেয়। কুণাল রায় হচ্ছেন সেই সব লোকের অন্যতম।

কুণাল রায় শৈশবে জানতে পেরেছিলেন, ওঁর দু'হাতের তালুতে কালো কালো লোম ওঁর বাবার মনে সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। ওঁর মা তখন বেঁচে থাকার ফলে তখনকার মত ভুজঙ্গনারায়ণের সন্দেহটা চাপা পড়ে যায়।

কিন্তু কুণাল রায় বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে টের পান যে মাংস খাওয়াটা ওঁর কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে।

এর অনেক বছর পরে একদিন ভুজঙ্গনারায়ণ অমানুষিক কণ্ঠে চিৎকার করে কুণাল রায়কে জানালেন, কুণাল রায় মায়া-মঞ্জিলে

থাকলে ওঁর টুঁটি ছিঁড়ে সে রক্তপান করতে পারে। কেন না, কুণাল রায়ের দু'হাতের তালুতে মোটা মোটা কালো লোম আছে। কুণাল রায় নাকি নেকড়ে বাঘের মন নিয়ে জন্মেছিলেন।

ভুজঙ্গনারায়ণের বাক্যবাণ সহ্য করতে না পেরে উনি মায়া-মঞ্জিল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

কুণাল রায় কিন্তু আসলে ওঁর বাবাকে শ্রদ্ধা করতেন। বাবার সংবাদ নেবার জন্য যেদিন মায়া-মঞ্জিলে এলেন, তার আগেই ভুজঙ্গ-নারায়ণ পরপারের পথে যাত্রা করেছেন। পরে মুরারীমোহনের মুখে কুণাল রায় জানতে পারলেন, ভুজঙ্গনারায়ণ রায়ের উইলের সারমর্ম শোনানোর জন্য সোমপ্রকাশ নাগ এখানে ওঁদের পাঁচ ভাইকে একত্র করবেন।

শুনে একটা মতলব এলো কুণাল রায়ের মাথায়। মুরারীমোহনকে কলকাতায় সরিয়ে দিয়ে তিনি মুরারীমোহনের ভূমিকা নিলেন। ভূমিকাটা নিতে ওঁর কোন কষ্ট হলো না। কেননা, কলকাতার স্টেজে উনি কিছুদিন অভিনয় করেছিলেন।

তারপর সকলে এখানে এলে উনি নিজেকে যাচাই করতে চাইলেন, আসলে সত্যিই উনি নেকড়ের মন নিয়ে জন্মেছেন কিনা। ফলে ওঁকে নেকড়ে-মূর্তিধারী মানুষ সাজতে হলো। নেকড়ে-মূর্তিধারী মানুষ এবং রক্তশোষক বাদুড়ের গল্পটা ওঁর জানা ছিল। সেই গল্পটা বিশ্বাস করে উনি বিপজ্জনক ভয়াবহ দানবে পরিণত হলেন।

এ কথাটা আপনারা ভুলে যাবেন না, আদিম মানুষের পশু-প্রবৃত্তি এখনো আমাদের মন থেকে মুছে যায়নি। একটু অনুকূল আবহাওয়া পেলে সেই পশু-প্রবৃত্তিটা আমাদের মনে জেগে উঠতে পারে আচমকা।

তবে প্রথম হত্যাকাণ্ডে এটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম, কুণাল রায়ই এই ষড়যন্ত্রের নায়ক। তার কারণ, পরিতোষ রায় নিহত হলে ভুজঙ্গ-নারায়ণের উইলটা আয়রণ-সেফে পাওয়া যায়। এবং সব চাইতে আশ্চর্যের বিষয়, কাকাবাবুর পকেটে চাবির রিংটাও পাওয়া যায়।

পরিতোষবাবু আয়রণ-সেফ খুলে উইল পড়েছিলেন। উইলটা কুণাল রায়েরও দেখবার সাধ ছিল। পুরানো সন্দেহটা পরখ করে দেখবার জন্যে উনি সেই রাত্রে ভুজঙ্গনারায়ণের শয়নকক্ষে ঢুকে নেকড়ে-মূর্তি নিয়ে পরিতোষবাবুকে আক্রমণ করেছিলেন। পরে উইল দেখে জানতে পেরেছিলেন, ভুজঙ্গনারায়ণ ওঁকে সমস্ত কিছু দিয়ে গেছেন। তাই উইলটা যথাস্থানে রেখে দিয়েছিলেন এবং পরিতোষবাবুকে হত্যা করে ওঁর বাবার কথার সত্যতাটা যাচাই করেছিলেন।

মহীতোষবাবুকে হত্যা করে উনি ওর মায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

হত্যাকারীকে প্রথম হত্যা অনুষ্ঠান করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। তার কারণ সেদিন মায়া-মঞ্জিলের সমস্ত ঘরের দরজাগুলোই খোলা ছিল। বাইরে থেকে সে আইভিলতার মোটা ডাল বেয়ে ওপরে উঠেছিল।

দ্বিতীয় হত্যা-অনুষ্ঠানটা হত্যাকারীর পূর্বপরিকল্পিত ছিল। আইভিলতার মোটা ডাল বেয়ে দোতলার কার্নিশে উঠে হত্যাকারী মহীতোষ রায়ের ঘরের জানলার কাঁচের শার্সি ভেঙে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। আচমকা আক্রমণে মহীতোষবাবু ভীত হয়ে আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। তারপর আমরা যখন সে ঘরে যাই, তার ঠিক একটু আগেই হত্যাকারী আইভিলতার ডাল বেয়ে নীচেয় নেমে গেছে।

কপালে জমে ওঠা গুঁড়ো গুঁড়ো ঘামগুলো মুছে নেবার জন্য দিলীপ পকেট থেকে রুমাল বার করল।

পার হয়ে গেল কয়েকটি অসাড় নিশ্চেতন মুহূর্ত। ঘরের মধ্যে রহস্যময় স্তব্ধতা, নিটোল নিবিড় !

রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে নিয়ে দিলীপ আবার বলে চলল— এখানে এসে প্রথম হত্যাকাণ্ড আর মায়া-মঞ্জিলের ইতিহাস শুনে আমার ধারণা হয়েছিল, রহস্যের মেঘনাদ একমাত্র কুণাল রায় ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।

কিন্তু কুণাল রায় কে সঠিকভাবে চিনব কী করে ? কেউ তো ওকে চেনে না। তখন ভাবলাম, মহীতোষবাবু এবং অনুতোষবাবুর মধ্যে হয়ত কোন একজন কুণাল রায়।

কিন্তু পরে আমার সে ধারণা পালটে গেল।

অনুতোষবাবু কুণাল রায় হতে পারেন না। কেন না, অট্টহাসির আওয়াজের সময় উনি আমার কাছে ছিলেন।

মহীতোষবাবু নিহত হয়ে আমার সমস্ত সন্দেহ দূর করে দিয়েছিলেন।

সন্তোষবাবু কুণাল রায় হতে পারেন না এই কারণে যে, উনি কাকা-বাবুকে অজ্ঞান করে ওঁর পকেট থেকে আয়রন-সেফের চাবিটা চুরি করেছিলেন। আয়রন-সেফের মধ্যে ভুজঙ্গনারায়ণের যে উইলটা ছিল, সেটা নষ্ট করাই ওঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সন্তোষবাবু কুণাল রায় হলে উইলটা আদৌ নষ্ট করবার চেষ্টা করতেন না। তার কারণ তো আপনারা জানেন।

কাকাবাবুর ওপর আমার বেশ খানিকটা সন্দেহ হয়েছিল। কিন্তু

অ্যাটর্নি পরিচয় দিয়ে কোন প্রতারক ওঁর নাম নিয়ে যদি এখানে আসত, তাহলে তার লাভবান হওয়ার কী কারণ থাকত? কিছুই না। তবু নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্যে কলকাতায় টেলিগ্রাম করে জানলাম, উনিই বিখ্যাত অ্যাটর্নি সোমপ্রকাশ নাগ।

কাকাবাবু তখন সন্দেহের উর্ধ্বে, তখন ভজহরিকেও সন্দেহ করা চলে না। কেন না ভজহরি ওঁর পরিচিত।

তাহলে একমাত্র বাকী রইলো মুরারীমোহন।

কুণাল রায় মুরারীমোহনের ভূমিকা নিয়ে পুরানো ব্যথাকে জাগিয়ে তুলেছিল। শয়তানের মন নিয়ে। দেবতা কুণাল রায় শেষে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শয়তান কুণাল রায়ে পরিচিত হয়েছিল।

মানুষের শুভবুদ্ধি দুর্বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হলে মানুষের পক্ষে এমনি নীচ হওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। অন্যায় না করলে হয়ত ওঁকেও গতরাত্রে আমার হাতে নৃশংসভাবে মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হতো না। অধর্মের কল এমনিভাবেই নড়ে।

প্রথম হত্যা-অনুষ্ঠানের ভেতর থেকেই আমি প্রমাণ-সূত্র আর হত্যাকারীর উদ্দেশ্য ধরতে পেরেছিলাম।

উদ্দেশ্যটা তো আগেই বলেছি।

সূত্রটা হচ্ছে, প্রথম ঘটনার পরদিন সকালে কাকাবাবুর পকেটে চাবির রিংটা অদ্ভুতভাবে ফিরে আসা এবং উইলটা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া।

পরিতোষ রায় নিশ্চয় চাবির রিংটা কাকাবাবুর পকেটে ফেরত দিয়ে আসেনি—ফেরত দিয়ে এলে উইলটা অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যেত না। সুতরাং কে এমন লোক হতে পারে, যে উইলটা অক্ষত

রাখতে চায় ? উত্তর হচ্ছে, কুনাল রায়। কেননা, ভুজঙ্গনারায়ণের উইলে কুণাল রায়ই একমাত্র লাভবান হোতেন।

সমস্ত বিষয়টা ছিল যেমন চিন্তার তেমনি ঘোরালো। কিন্তু একটা দুঃখকর ঘটনার ভেতর দিয়ে সমস্ত রহস্যের যবনিকাপাত হোলো। নিজের প্রাণ দিয়ে কুণাল রায় পাপের দেনা শোধ করলেন।

দিলীপ চুপ করল।

তখনো অটুট নীরবতা। সকলে যেন পাষাণ হয়ে গেছেন।

অপূর্ব স্মিতহাস্যে মুখখানা ভরিয়ে তুলে দিলীপ বলল—যাক, সমস্ত বিষয়টা যখন আর কারো কাছে অস্বচ্ছ নেই, তখন নিশ্চয় আজ সাড়ে ন'টার ট্রেনে আমার যাওয়া চলতে পারে ? ব্যাপারটা যখন মিটে গেছে, তখন—

অনুনয়ের ভঙ্গিতে অবিনাশ বললেন—না না, আজ সাড়ে ন'টার ট্রেন কেন। কাল সাড়ে ন'টার ট্রেনে যাবেন। আমার বাড়ি থেকে না খাইয়ে কি আর আপনাকে ছাড়তে পারি, আবার এখানে কবে আসবেন, তা কে জানে!

—বেশ, তাই হবে। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে দিলীপ ধপ্ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়ল।

বাইরে তখন ক্লান্ত সূর্যের বর্ণালি মুছে এসেছে। রাত্রি আসছে।

দেওয়ালের ঝাড়-বাতিটা জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য ভজহরি এগিয়ে গেল।

সমাপ্ত

www.boiRboi.blogspot.com